জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৪ (নব পর্যায়)

পতঙ্গ বাহিত আরও কয়েকটি গুরুতর রোগ

কালাজ্বর
চিকুনগুনিয়া
ফাইলেরিয়া

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন – ৪ (নব পর্যায়)

পতঙ্গ বাহিত আরও কয়েকটি গুরুতর রোগ

কালাজ্বর
চিকুনগুনিয়া
ফাইলেরিয়া

সংকলন ও সম্পাদনা

অরণি সেন ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

Janaswasthya Bulletin 4 (Naba Parjay)
On Kala-azar, Chikungunya and Lymphatic Filariasis

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৫

গ্রন্থসত্ব : সীমা রায়

প্রকাশনা : অরণি সেন
'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন'
৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পরিবেশনা : 'উবুদশ', ৮এ নবীন পাল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ৯৪৩৩৮১৯১০৩, ৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

প্রচ্ছদ ও বর্ণস্থাপন : রাজু রায়

মুদ্রণ : শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

যোগাযোগ : ssunnayan@gmail.com
www.ssu.2011.com

সংগ্রহ : ৮০ টাকা

উৎসর্গ

ডা: উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

সূ চি প ত্র

কালাজ্বর	নিতাই প্রামাণিক	৭
বিস্মৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কাজের চর্চা আগামীতেও চলবে	—সিদ্ধার্থ জোয়ারদার	১৯
কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি: সাফল্য ও কিছু সীমাবদ্ধতা	—দীপঙ্কর মাজী	২৪
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী - বিস্মরণে বৈজ্ঞানিক, বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক সাধনা	—জয়ন্ত ভট্টাচার্য	২৮
কালাজ্বরের গল্প এবং বরেণ্য বাঙালি চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ	—বাপ্পাদিত্য রায়	৫০
VISCERAL LEISHMANIASIS OR KALA-AZAR	—Rama Prosad Goswami	৫৯
ডেঙ্গুর ভাই চিকুনগুনিয়া	—অরণি সেন	৬৯
Lymphatic Filariasis : Toward Elimination	—Snigdha Banerjee	৭৩

কালাজ্বর

নিতাই প্রামাণিক

ভূমিকা: কালাজ্বর ‘লিস্‌ম্যানিয়া’ প্রজাতির আণুবীক্ষণিক এককোষী পরজীবী ঘটিত অসুখ। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতোই কালাজ্বর অসুখ দীর্ঘমেয়াদী জ্বর, রক্তাল্পতা, যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি নিয়ে প্রকাশ পায়। ‘লিস্‌ম্যানিয়া’ পরজীবী সংক্রমণ প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়াও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, কাঠবিড়ালী, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এইসব প্রাণীরা কালাজ্বর জীবাণুর ‘ভাণ্ডার’ (Reservoir) হিসাবে বিবেচিত হয়। অবশ্য ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালে মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের মধ্যে এই পরজীবীর সন্ধান এখনও মেলেনি। এর পরজীবীর নাম ‘লিস্‌ম্যানিয়া ডোনোভ্যানি’ (Leishmania donovani)।

মানুষের মধ্যে এই পরজীবী সংক্রমণের রোগীর শ্রেণীবিভাগ:—(১) কালাজ্বর (Kala-azar or Visceral Leishmaniasis)—দীর্ঘমেয়াদী জ্বর, রক্তাল্পতা, যকৃত ও প্লীহা বৃদ্ধি সহ এক মারণঘাতক অসুখ যার চিকিৎসা না করলে ৯৫% রোগীর মৃত্যু হয়। **(২)** চামড়ায় পুরনো ঘা-এর উপসর্গ নিয়ে **‘কিউটেনিয়াস লিস্‌ম্যানিয়াসিস’ (CL)**—মধ্যপ্রাচ্যে, রাশিয়ায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় ‘লিস্‌ম্যানিয়া ট্রপিকা’ ও ‘লিসম্যানিয়া মেজর’, পরজীবী ঘটিত অসুখ। **(৩)** চামড়া ও সংলগ্ন শ্লেষ্মাঝিল্লির (Mucous membrane) পুরোনো ঘা-এর উপসর্গ নিয়ে **‘মিউকোকিউটেনিয়াস লিস্‌ম্যানিয়াসিস’ (MCL)**—আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় ‘লিস্‌ম্যানিয়া মেজর’ ও ‘লিস্‌ম্যানিয়া ব্রাজিলিয়েনসিস্’ পরজীবী ঘটিত অসুখ। **(৪)** শুধুমাত্র চামড়ায় বহু জায়গায় ‘লিস্‌ম্যানিয়া ইথিওপিয়া’ ও ‘লিস্‌ম্যানিয়া অ্যামাজোনেন্‌সিস্’ পরজীবী ঘটিত সংক্রমণে **‘ডিফিউজ কিউটেনিয়াস লিস্‌ম্যানিয়াসিস্’ (DCL)** হিসাবে আফ্রিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই রোগ প্রকাশ পায়। **(৫) PKDL বা ‘পোষ্ট কালাজ্বর ডারমাল লিস্‌ম্যানিয়াসিস্’**—কালাজ্বর অসুখ চিকিৎসায় সেরে যাবার পর বা সাব-ক্লিনিক্যাল কালাজ্বর অসুখ, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রভাবে সেরে যাবার পর কোন কোন মানুষের মধ্যে এই পরজীবী (লিস্‌ম্যানিয়া ডোনোভ্যানি) মানুষের চামড়ায় দীর্ঘমেয়াদী বাসা বাঁধে এবং

চামড়ায় ধীরে ধীরে প্রথমে সাদা দাগ, পরে তামাটে লাল হয়ে চামড়া মোটা হয়ে যায় এবং শেষে গুটি গুটি অসংখ্য অর্বুদের (ঘা বিহীন) আকারে প্রকাশ পায়—ঠিক যেমন সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর মতো বহিঃপ্রকাশ সেইরূপ, কিন্তু চামড়ায় সংবেদন অটুট থাকে ও মাংস পেশীর দুর্বলতা হয়ে বিকলাঙ্গতা প্রকাশ পায় না। এইসব রোগীদের কোন জ্বর উপসর্গ, রক্তাল্পতা বা ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি কিছুই হয় না।

পৃথিবীতে 'লিস্‌ম্যানিয়াসিস্' রোগের ব্যাপ্তি :—পৃথিবীতে প্রায় ৮৮টি দেশে 'লিস্‌ম্যানিয়াসিস্' রোগ হতে দেখা যায়। বছরে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ 'কিউটেনিয়াস লিস্‌ম্যানিয়াসিস' রোগী ও ৫ লক্ষ 'ভিসেরাল লিস্‌ম্যানিয়াসিস্' বা কালাজ্বর রোগী আক্রান্ত হয়। কালাজ্বর সাধারণতঃ গরীব খেটেখাওয়া অপুষ্টির শিকার গ্রামের মানুষদের ও দরিদ্র আদিবাসী মানুষদের হতে দেখা যায়। পৃথিবীতে শতকরা ৯০ জন কালাজ্বর রোগী হ'ল ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, সুদান ও ব্রাজিল দেশের, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কালাজ্বর রোগীর ৭০% হল ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের রোগী। পৃথিবীতে ১০০ কোটির উপর মানুষ কালাজ্বর অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করে। 'লিস্‌ম্যানিয়া' পরজীবী সংক্রমিত রোগীদের ১০ শতাংশ কালাজ্বর রোগী, ১০% PKDL রোগী এবং ৮০% রোগীদের কোন লক্ষণ থাকে না। বর্তমানে ভারতের ৫৪টি জেলায় কালাজ্বর হয়। তার মধ্যে বিহারের ৩৩টি জেলা, ঝাড়খণ্ডের ৪টি জেলা, পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলা ও উত্তর প্রদেশের ৬টি জেলায় কালাজ্বর রোগী পাওয়া গেছে। প্রায় ১৭ কোটি মানুষ ভারতের কালাজ্বর অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস করে, সাধারণতঃ ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এবং, যুবক যুবতীরা কালাজ্বর রোগের শিকার। ভারতে ২০২৩ সালের মধ্যে কালাজ্বর নির্মূলের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখনও কালাজ্বর ও PKDL রোগীর রোগ নির্ণয় হয়ে চলছে এবং বেশ কিছু রোগীর

পূর্ব ভারতের একটি গ্রাম

সন্ধান মিলছে। কালাজ্বর একটি অবহেলিত ক্রান্তীয় রোগ (নেগলেকটেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ বা NTD)। WHO তার NTD Road Map Goal-এ ২০৩০ সালের মধ্যে কালাজ্বর সহ আরও মারণঘাতী সংক্রামক রোগগুলি নির্মূলকরণের কর্মসূচী নিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সমগ্র ভারত জুড়ে কালাজ্বরের ভীষণ দাপট দেখা গেছে। কয়েক বার মহামারী রূপে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, তাই-এর নাম কোথাও 'কালাজ্বর' বা কোথাও 'কালাদুঃখ', 'জ্বরবিকার', 'বর্ধমান জ্বর', 'দমদম ফিভার' ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। একসময়ে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চলে, উড়িষ্যার কটকের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় অববাহিকার সমতলে, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে এই রোগ বেশী হতে দেখা গেছে। প্রায় প্রতি ১৫ বছর অন্তর এই অসুখ মহামারী হতে দেখা গেছে। বিজ্ঞানী ডাক্তার নেপিয়ার, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ডাঃ আর. এন. চোপড়া, ডাঃ পি. সি. সেনগুপ্ত, ডাঃ রোনাল্ড রস ভারতে কালাজ্বর গবেষণার পথিকৃৎ। ডাঃ নেপিয়ার দেখেছেন কালাজ্বর সাধারণতঃ ২০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে হতে দেখা যায়। সারা বছরে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এই সব অঞ্চলে (গড়ে ১০০-১৫০ সে.মি.) এবং গড় আর্দ্রতা শতকরা ৭০% এর উপর হলে এবং আর্দ্র দোঁয়াশ মাটির সমতলভূমি এবং, তাপমাত্রার ব্যাপ্তি ৪° থেকে ৩৮° সেলসিয়াস এর মধ্যে এবং, তাপমাত্রায় প্রতিদিনের তারতম্য ১০° সেলসিয়াস এর কম হলে এবং প্রচুর গাছপালা, জঙ্গল, জলাভূমিযুক্ত গ্রাম এই রোগ ছড়াবার আদর্শ পরিবেশ।

'বর্ধমান জ্বর' সম্বন্ধে গবেষণা বহু ডাক্তার বিজ্ঞানী করেছেন। রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়ায় জীবাণু ১৮৮০ সালে বিজ্ঞানী ল্যাভেরান ও মেসনিল আবিষ্কার করলেও কালাজ্বরের জীবাণু প্লীহা, রক্তমজ্জা ও যকৃতের ম্যাক্রোফাজ কোষে (R. E. Cell) ১৯০৩ সালে আবিষ্কার করেন চার্লস ডোনোভ্যান ও উইলিয়াম লিস্‌ম্যান নামক দুই ইংরেজ বিজ্ঞানী। তাই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ব্যাপকভাবে ১৮৭৬ পর্যন্ত চলার পরও বেশ কয়েক দশক ধরে 'বর্ধমান জ্বর' দক্ষিণবঙ্গে চলেছিল, যদিও প্রকোপ ছিল কম। ম্যালেরিয়া ঔষধ 'কুইনাইন' খাইয়ে ছোট ছোট ফিভার ডিসপেন্‌সারি ও হাসপাতাল থেকে অবাধে রোগীদের চিকিৎসা হত। ১৯০৩ সালে কালাজ্বরের পরজীবী আবিষ্কারের পরে বিজ্ঞানীদের অনুমান হল বর্ধমান জ্বরের কারণ

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়া, তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কালাজ্বরের প্রভাবও ছিল। ডাঃ লিওনার্ড রজার্স, ট্রপিক্যাল অসুখের অনুসন্ধানের পথিকৃৎ এই জ্বরকে 'কালাজ্বর' বলেই নিশ্চিত মনে করতেন। ১৮৮২ সালে আসাম গর্ভমেন্টের স্যানিটারি কমিশনার ডাঃ ক্লার্ক এই জ্বর সম্বন্ধে ডাঃ ম্যাকনোউল দ্বারা পাঠানো ১২০ জন রোগীর তথ্য নিয়ে এই রোগকে 'ভীষণ রকমের ম্যালেরিয়া ঘটিত অস্থিচর্মসার অবস্থা' (Malarial Cachexia) বলে নামকরণ করলেন। গারো পাহাড়ের সানুদেশে এই রোগে প্রচুর রোগী কালো রঙ হয়ে রক্তশূন্য হয়ে মারা যেত বলে একে 'ব্ল্যাক ফিভার'ও বলা হত। ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় বহু গ্রাম এই রোগের মৃত্যুতে জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

অবিভক্ত বঙ্গে এই রোগের মহামারী চলে ছিল ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৩ সাল অবধি। ডাঃ বেন্টলে এই জ্বরকে ভূমধ্যসাগরীয় জ্বর বা 'মাল্টা ফিভার' নাম দিলেন, নীল ক্যাম্পবেল ভাবলেন হুককৃমি ও ভীষণ ম্যালেরিয়া মিলিত রোগের প্রকাশ এই জ্বর। ১৮৯৮ সালে হেরল্ড ব্রাউন নিশ্চিত হলেন পূর্ণিয়া জেলার এই জ্বর (কালাদুখ) এবং, আসাম প্রদেশের কালাজ্বর একই অসুখ। ডাঃ রোনাল্ড রস দার্জিলিং-এ জ্বর আক্রান্ত রোগী নিয়ে গবেষণা করে এই জ্বর 'কালাজ্বর' বলে সন্দেহ করলেন, ইংল্যাণ্ডের ট্রপিক্যাল অসুখের পথিকৃত গবেষক ডাঃ ম্যানসন 'বর্ধমান জ্বর'কে ম্যালেরিয়া অসুখ নয় বলে বিশ্বাস করতেন কারণ এই জ্বর ম্যালেরিয়া অসুখের মতো কাঁপুনি জ্বর বিশিষ্ট নয়—এবং এই জ্বরে রোগীকে বেশী ডোজে কুইনাইন খাওয়ালেও জ্বর সারে না। ১৯০৩ সালে রজার্সের ধারণা ছিল এই জ্বর বোধ হয় 'ট্রিপানোসোমা' জাতীয় প্রোটোজোয়া ঘটিত। এরপর ১৯০৩ সালে কালাজ্বরের পরজীবী আবিষ্কার হলে এর প্রকৃত কারণ জানা গেল।

কালাজ্বরের বাহক বেলে মাছি

আফ্রিকায় এই 'কালাজ্বর' ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশে বিশেষত সুদান, ইথিওপিয়ায় মহামারী রূপ নিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের চারপাশের বিভিন্ন দেশে, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা কালাজ্বরের প্রকোপে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও আমাজন নদীর দুই তীরবর্তী অববাহিকায় প্রচুর রোগী মারা যেত। ওই সব

স্থানেও ওই রোগের জীবাণু ‘লিসম্যান ডোনোভ্যান বডি’ আবিষ্কার হল জ্বরাক্রান্ত রোগীর দেহে। ‘কালাজ্বর’ অসুখের পরজীবী আবিষ্কারের বহু পরে ১৯২১ সালে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অক্লান্ত গবেষণায় কালাজ্বরের জীবনদায়ী ঔষধ ‘ইউরিয়া স্টিবামাইন’ আবিষ্কার করেন।

কালাজ্বর ‘স্যাণ্ডফ্লাই’ (ফ্লেবোটোমাস আর্জেন্টিপিস্) বাহিত এক প্রকার খুব ক্ষুদ্র (লম্বায় ২-৪ মাইক্রোমিটার) লোহিত রক্তকণিকা (R.B.C.)-র এক তৃতীয়াংশ আকারের এককোষী পরজীবী কোষ (প্রোটোজোয়া) সংক্রমিত অসুখ যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী কোষ ‘রেটিকুলো এণ্ডোথেলিয়াল সেল’ (R. E. Cell) ও শ্বেত রক্তকণিকা মনোসাইটকে আক্রমণ করে এবং, তাদের কোষের ভেতর পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ক্রমাগত দ্বিভাজনের দ্বারা সংখ্যায় বাড়ে এবং ধীরে ধীরে এই রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী কোষ (L. D. Body) শরীরে রোগ প্রতিরোধকারী অঙ্গ, যেমন—প্লীহা (Spleen), যকৃৎ (Liver), লসিকাগ্রন্থি (Lymph gland), হাড়ের মজ্জা (Bone marrow), অন্ত্রের ঝিল্লি পর্দা (Peritoneum) ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। সৈনিক কোষগুলি ক্রমশঃ কালাজ্বরের জীবাণু দ্বারাই পূর্ণ থাকে। শুধু তাই নয় শরীরে রোগ প্রতিরোধকারী অন্যান্য কোষ যেমন সাহায্যকারী লিম্পোসাইটের সংখ্যাও খুব কমে যায়। শরীরে কালাজ্বরের প্রভাবে প্রতিবিষ (Antibody) প্রচুর তৈরী হয় বটে, কিন্তু তা কালাজ্বরের পরজীবী জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে না। ক্রমশঃ হাড়ের মজ্জা থেকে রক্তের আনুষঙ্গিক কোষীয় উপাদান (লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা) তৈরীও ভীষণভাবে ব্যাহত হয় এবং ক্রমশঃ শরীরে ভীষণ রক্তাল্পতা হয় এবং কখনও কখনও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হতে পারে। প্লীহা এবং অনেক সময় যকৃৎও আকারে খুব বড় হয়, হাত-পা অনেক সময় ফুলে যায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে কমে যাওয়ার জন্য এ রোগীরা সহজেই জীবাণুঘটিত অন্য অসুখে ভোগে। যেমন—যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, আন্ত্রিক, রক্তামাশয় ও অন্যান্য জীবাণুর সংক্রমণে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।

কালাজ্বরের বাহক এক ক্ষুদ্র সন্ধিপদী মাছি—’স্যান্ডফ্লাই’—বৈজ্ঞানিক নাম ‘ফ্লেবোটোমাস্ আর্জেন্টিপিস্’। প্রায় ৬০০ প্রজাতির স্যাণ্ডফ্লাই-কে ৬টি জেনাসে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে দুটি জেনাস—‘ফ্লেবোটোমাস্’ পাওয়া যায় এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে এবং ‘লুটগোমিয়া’ পাওয়া যায় আমেরিকায়।

ভারতে কালাজ্বরের একমাত্র বাহিকা মাছি হল ফ্লেবোটোমাস্ আর্জিন্টিপিস্'— এরা ডি.ডি.টি, পাইরেথ্রাম ইত্যাদি কীটনাশক প্রয়োগে খুব সহজেই মারা যায়। ফাটলযুক্ত মাটির দেয়াল বা পাথরের দেওয়ালের ফাটলযুক্ত বসতবাড়ীর ভিতরের দেওয়ালে ও গোয়াল ঘরের দেওয়ালের খাঁজে ও ফাটলের ভিতরে ছায়াযুক্ত, আলো আঁধারি পরিবেশে এবং আবর্জনাপূর্ণ বদ্ধ বাতাসযুক্ত গবাদিপশুর বাসস্থানের কাছাকাছি পরিবেশেই 'স্যাণ্ডফ্লাই'-এর উপযুক্ত বাসস্থান। একই ঘরের মধ্যে পরিবারের বহুসংখ্যক মানুষ বাস করলে এবং ঘরে হাওয়া চলাচল ভাল ভাবে না হলে এবং আবর্জনা জমা রাখলে এই সব বেলে মাছি সংখ্যায় খুবই বৃদ্ধি পায় এবং কালাজ্বর রোগ সহজেই ছড়ায়। কালাজ্বর ও PKDL রোগীকে 'স্যাণ্ডফ্লাই' কামড়ে রক্তশোষণ করলে ঐসব মাছির অন্ত্রে শোষিত রক্তের মধ্যে কালাজ্বরের পরজীবীর আকার পরিবর্তিত হয়ে 'অ্যামাসটিগোট' থেকে 'প্রোম্যাসটিগোট' হয় এবং অবিরাম দ্বিভাজনে সংখ্যায় বহুগুণ বেড়ে 'স্যাণ্ডফ্লাই' মাছির গলবিল ও মুখগহ্বর তাতে পূর্ণ হয় এবং ঐরূপ অবস্থায় কোন সুস্থ মানুষকে ঐ স্যাণ্ডফ্লাই কামড়ালে সেই মানুষের কালাজ্বরে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। 'স্যাণ্ডফ্লাই'-এর অন্ত্রে কালাজ্বরের পরজীবী যথেষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে কোন সুস্থ মানুষকে কামড়ে রোগবিস্তার করতে কমপক্ষে ১০ দিন সময় লাগে এবং বাহক মাছি অনুকূল পরিবেশে ও ঋতুতে ঐ রোগ ছড়ায়। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হতে জুলাই মাস পর্যন্ত ঐ মাছি প্রচুর পরিমাণে সংখ্যায় বাড়ে এবং জনজীবনে কালাজ্বর ছড়াবার প্রকৃষ্ট সময় বছরের ঐ সময়টুকু।

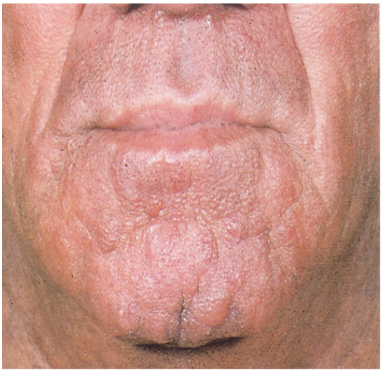

মানবশরীরে 'কালাজ্বরের' প্রকাশ—সংক্রমিত 'স্যাণ্ডফ্লাই' কামড়ানোর ৩/৪ সপ্তাহ পর থেকে এক বৎসর কাল বা তারও অধিক সময়ের মধ্যে ঐ রোগীর শরীরে কালাজ্বরের নানান উপসর্গ দেখা যায়, যা প্রধানতঃ অনিয়মিত জ্বর দীর্ঘ দিন ধরে চলে, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে প্রায় রক্তশূন্য হয়, প্লীহা ও

যকৃতের ক্রমশঃ স্ফীতির জন্য উদরের স্ফীতি হয়, পাতলা পায়খানা, রক্ত আমাশয়, কাশি ও কফ্ তোলা, নিউমেনিয়া, পা ফোলা, ক্রমশঃ ভীষণ দুর্বলতা ও শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ে। কখনও কখনও রোগীর শরীরে যক্ষ্মা-র লক্ষণ দেখা দেয়, সিগেল্লা ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রক্তআমাশয়, মুখগহ্বরে গ্যাংগ্রিন (‘ক্যানক্রাম ওরিস’), শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত হয়ে রোগ জটিল হয়ে পড়ে।

মানবশরীরে PKDL অসুখের প্রকাশ—কালাজ্বর অসুখ থেকে কোন কোন রোগী সুস্থ হয়ে যাবার পর বা কালাজ্বর অধ্যুষিত অঞ্চলে রোগ লক্ষণহীন আপাত সুস্থ মানুষ, প্রকৃতিগত ভাবে সুস্থ হয়ে যাবার পর ২ বছর পর থেকে ২০ বছর সময় পর্যন্ত ওই মানুষের মধ্যে এই পরজীবী (LD Body) মানুষের চামড়ায় দীর্ঘমেয়াদী বাসা বাঁধে এবং চামড়ার ছড়ানো ছিটানো সাদা/ফেকাশে দাগ, পরে লালচে, হয়ে ঐ চামড়ার অংশ একটু পুরু হয় ও অবশেষে ঘাবিহীন গুটি গুটি অসংখ্য অর্বুদের আকারে প্রকাশ পায়—ঠিক যেমন সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর মত বহিঃপ্রকাশ সেইরূপ, কিন্তু চামড়া অসাড় হয় না বা মাংসপেশীর দুর্বলতা বা হাত-পায়ের বা মুখমণ্ডলের বিকলাঙ্গতা প্রকাশ পায় না। এই অসুখকে ‘পোষ্ট কালাজ্বর ডারমাল লিসমেনিয়াসিস’ (PKDL) বলে। এইসব রোগীদের অন্য কোন উপসর্গ যেমন জ্বর, রক্তাল্পতা, ওজন কমে যাওয়া বা রোগের জটিলতা কিছুই প্রকাশ পায় না। চামড়ায় এই সংক্রমণযুক্ত আপাত অভিযোগবিহীন রোগী কিন্তু জনজীবনে কালাজ্বর রোগ ছড়াবার ‘ভাণ্ডার’ হিসাবে বিবেচিত হয়। এইসব PKDL রোগীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভুলবশতঃ কুষ্ঠরোগ ভেবে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওই অঞ্চলের পরিবেশে স্যাণ্ডফ্লাই ওই PKDL রোগীকে কামড়ে পরজীবী দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং কিছুদিন পর থেকে ওই সংক্রমিত স্যাণ্ডফ্লাই ক্রমাগত অন্য সুস্থ মানুষকে কামড়ে তাদের মধ্যে কালাজ্বর সংক্রামিত করে।

কালাজ্বর অসুখের রোগ নির্ণয় : (১) কালাজ্বর অধ্যুষিত ভূখণ্ডে বসবাসকারী বা ঐ ভূখণ্ডে কিছুদিন অতিবাহিত করে ফিরে আসা মানুষ তিন চার সপ্তাহ বা তার বেশী সময় জ্বরে ভুগতে থাকলে এবং প্লীহা ও যকৃত বড় হলে এবং বার বার রক্তপরীক্ষায় ম্যালেরিয়া পরজীবী না পাওয়া গেলে বা ম্যালেরিয়ার ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করলেও জ্বর না ছাড়লে এবং টাইফয়েড ও অন্যান্য জীবাণুর সংক্রমণ পরীক্ষায় না ধরা পড়লে ঐ রোগীর কালাজ্বর হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। (২) ঐ রোগীর রক্তের ২ মি.লি. সিরাম নিয়ে ২ ফোঁটা

ফর্মালিন সলিউশন মিশিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিলে সিরাম সেদ্ধ করা ডিমের সাদা অংশের মত জমাট বাঁধে (নেপিয়ার অ্যালডিহাইড টেষ্ট)। এই পরীক্ষা পজিটিভ হলে কালাজ্বর হয়েছে বলে ধরা হয়। প্লাজমা প্রোটিনের ইমিউনো গ্লোবিউলিন বেড়ে গিয়ে এই টেষ্ট পজিটিভ ধরা পড়ে। (৩) কালাজ্বরের সংক্রমণে নির্দিষ্ট ইমিউনোগ্লোবিউলিন IgG এবং IgM-এর উপস্থিতি জানার জন্য বর্তমানে rk39 অ্যান্টিজেন স্ট্রিপ ELISA পরীক্ষায় ১০-১৫ মিনিট সময়ের মধ্যেই গ্রামে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই পরীক্ষা করা যায়। পকেটে করে গ্রামে এই ELISA-র Kit strip স্বাস্থ্য কর্মী নিয়ে যেতে পারেন। (৪) হাড়ের মজ্জার রসে বা প্লীহার রসে (দৃঢ় সিরিঞ্জের মাধ্যমে টেনে নিয়ে) বা বড় হয়ে যাওয়া লসিকাগ্রন্থির রস কাঁচের স্লাইডে লেপে নিয়ে লিসম্যান রঞ্জক দিয়ে রঞ্জিত করে LD Body সাধারণ আলোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে পাওয়া গেলে কালাজ্বর রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয়। তবে এই পরীক্ষা বড় হাসপাতালেই করা সম্ভব। (৫) খুব আধুনিক হাসপাতালে PCR পরীক্ষায় কালাজ্বর রোগনির্ণয়ও করা যায়। (৬) কালাজ্বর রোগীর প্রস্রাবে পরজীবীর অ্যান্টিজেন নির্গত হয় এবং সেই অ্যান্টিজেন KATEX পরীক্ষায় জানার ব্যবস্থাও আছে। তবে রক্তে rk39 অ্যান্টিজেন strip ELISA-র সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কালাজ্বর রোগনির্ণয় ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে।

কালাজ্বর অসুখের চিকিৎসা :—(১) কালাজ্বর অসুখে অ্যান্টিমনি ধাতুকল্পের যৌগ প্রথম সফল ভাবে ব্যবহার হয়—ট্রাই ভ্যালেন্ট অ্যান্টিমনি যৌগ–অ্যামোনিয়াম পটাশিয়াম টার্টারেট শিরায় ইনজেকশন দিয়ে। কিন্তু এই ট্রাইভ্যালেন্ট যৌগ রোগীর পক্ষে খুব ক্ষতিকারক ছিল। (২) তাই ওই ঔষধের চেয়েও ভাল ঔষধ আবিষ্কারের জন্য অক্লান্ত গবেষণা করে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী অ্যান্টিমনির পেন্টাভ্যালেন্ট যৌগ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' ১৯১৯ সালে আবিষ্কার করেন। ১৯২১এ স্বীকৃতি পান। এই ঔষধ ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে কালাজ্বর রোগীর ওপর প্রয়োগ করে লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল। ইউরিয়া স্টিবামাইন ঔষধ শিরায় প্রয়োগ করা হত রোজ ১টি করে ১০ দিন এক একটি কোর্সে। অনেক রোগীর প্রাণরক্ষা হলেও এই ঔষধের রোগীর উপর বিষক্রিয়াও হত। তাই সব রোগী এই ঔষধের কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারতো না বা মারাও যেত। তাই আরও ভালো, ও কম ক্ষতিকারক ঔষধ আবিষ্কারের নিরন্তর চেষ্টা চলেছিল। (৩) ১৯৩৮ সালে চিনে 'কিকু' ও 'স্মিদ' অ্যান্টিমনির আর এক পেন্টাভ্যালেন্ট যৌগ 'সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট'

আবিষ্কার করেন। এই ঔষধ কালাজ্বরের সবচাইতে কার্যকরী ও কম ক্ষতিকারক জানা গেল। ফরাসীতে 'মেগ্লুমিন অ্যান্টিমনিয়েট' নামে অন্য একটি ঔষধও খুব কার্যকারী হিসাবে আবিষ্কৃত হল ও প্রয়োগ হতে লাগল। সোডিয়াম অ্যান্টিমনি গ্লুকোনেট (স্টিবানেট) একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত চলেছিল। সাধারণত রোজ একটি করে শিরায় বা মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেওয়া হত কুড়ি দিন প্রথম দফায়। রোগের উপশম না কমলে দ্বিতীয় কোর্সে আবার কুড়িটি ইনজেকশন রোগীকে দেওয়া হত। এর অ্যান্টিমনি, গ্লুকোনিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম যুক্ত 'সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট (SSG)' রূপটি ব্যবহৃত হত। তবে (৪) স্টিবানেট ছাড়াও 'পেন্টামিডিন আইসো ইথিওনেট' নামে আর একটি ঔষধ আবিষ্কার হয়েছিল এবং ইনজেকশন (মাংসপেশীতে) হিসাবে দেওয়া হত একদিন অন্তর, সপ্তাহে ৩ দিন করে—সম্পূর্ণ প্রথম কোর্সে ১৫টি ইনজেকশন দেওয়া হ'ত। এতেও ২ থেকে ৩টি কোর্সে মোট ৩০টি বা ৪৫টি ইনজেকশন দেওয়া হত রোগীকে। তবে কোমরের পেশীতে এই ইনজেকশন নেওয়ার ফলে অনেক রোগীর ইনজেকশন স্থলে পুঁজ হয়ে বড় ফোঁড়া হত। আবার এ ঔষধ প্রয়োগে বহুরোগীর অগ্ন্যাশয়ের ক্ষতি হয়ে ডায়াবেটিস হয়ে গেল। তাই একবিংশ শতকের প্রথমের দিকে স্টিবানেট ও পেন্টামিডিনের কালাজ্বর রোগীর উপর প্রয়োগ কমে এল।

(৫) ছত্রাক ধ্বংসকারী ঔষধ 'অ্যাম্ফোটেরিসিন বি'-র ওপর গবেষণায় এর কালাজ্বরের পরজীবীর উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং এই ঔষধে কালাজ্বরের রোগীরা খুব দ্রুত রোগমুক্ত হল—তা বিভিন্ন হাসপাতালে কালাজ্বর রোগীর উপর প্রয়োগ করে জানা গেল। এই ঔষধ 'অ্যাম্ফোটেরিসিন বি ডেসক্সিকোলেট'— জলে দ্রবীভূত ঔষধ, রোগীকে অন্ততঃ পরপর কুড়ি দিন বা একদিন অন্তর অন্তর কুড়ি দিন প্রতিদিন এক বোতল ৫% গ্লুকোজ দ্রবণের মধ্যে গুলে শিরার মাধ্যমে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা সময় ধরে দেওয়া হত। তবে জলে দ্রবণীয় এই অ্যাম্ফোটেরিসিন বি'-এর রোগীর উপর নানা ক্ষতিকর প্রভাব—যেমন 'অ্যানাফাইল্যাকটিক শক্', ভীষণ কাঁপুনি, ভীষণ জ্বর, মাথা ধরা, বমি, রক্তে পটাশিয়াম-কমে যাওয়া এবং কিডনির উপর ক্ষতিকর প্রভাব প্রায়ই হত। (৬) তাই অ্যাম্ফোটেরিসিনের শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে 'লাইপোসোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি'–নতুন টেকনোলজিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপিড ভেসিকলের মধ্যে 'অ্যাম্ফোটেরিসিন বি' প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল এবং তা গ্লুকোজ দ্রবণের

সাথে শিরার মধ্যে দিয়ে রোগীকে দেওয়া হল। এতে কোর্সের সমগ্র ডোজ ২ বা ৩ দিনে দেওয়া যায়। রোগীকে হাসপাতালে মাত্র ২ বা ৩ দিন থাকতে হয়। আম্ফোটেরিসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও খুব কম হয়। কারণ সমস্ত ঔষধ দ্রুত প্লাজমা অতিক্রম করে R.E. Cell-এর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। স্থির নিশ্চয় হয়ে ভারত সরকার কালাজ্বর রোগীর চিকিৎসা 'লাইপোসোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি' দ্বারা মাত্র একদিন শিরায় ইনফিউশন দিয়ে করার আদেশ বিগত ১৫ বৎসর ধরে বলবৎ করেছে—ডোজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১০ মি.গ্রা. অ্যাম্বোবি লাইপোসোমাল প্রতি কেজি শরীরের ওজন হিসাবে মাত্র ১ দিন। এতে শতকরা ৯৫ জন কালাজ্বর রোগী রোগমুক্ত হয়। (৭) একবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে কালাজ্বর নিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কারের গবেষণায় ক্যান্সারের ঔষধ 'মিলটেফোসিন'-এর ভীষণ কার্যকারিতা আবিষ্কার হল। 'মিলটেফোসিন' ঔষধ মুখে ট্যাবলেট হিসাবে রোগীকে খাইয়ে কালাজ্বর পরজীবী ধ্বংস হয়। চার সপ্তাহ ধরে রোজ ২.৫ মি.গ্রা./প্রতি কি.গ্রা. শরীরের ওজন হিসাবে একটি কোর্স সম্পূর্ণ করা হয়। ২৫ কেজি দৈহিক ওজনের ঊর্ধ্বে ১০০ গ্রামের ১টি ট্যাবলেট এবং ২৫ কেজির কম ওজনের রোগীকে ৫০ গ্রামের ১টি ট্যাবলেট রোজ হিসাবে ২৮ দিন দেওয়া হয়। ২ বছরের নীচে বাচ্চাদের এই ঔষধ দেওয়া হয় না। এই ঔষধ গর্ভাবস্থায় দেওয়া যায় না—বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই সন্তান উৎপাদন বয়সী স্ত্রী কালাজ্বর রোগীর অনুমতি নিয়ে তার প্রস্রাব পরীক্ষায় গর্ভসঞ্চার না হয়ে থাকলে সুনিশ্চিত হয়ে তবে মিলটেফোসিন খাওয়ানো হয়।

কোর্স শেষ করার পরও ঐ রোগীকে প্রথমে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত করা হয় চামড়ার উপরের স্তরের অংশে ব্লেড দিয়ে চিরে ও চেঁছে নিয়ে স্লাইডে স্টেইন করে মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করে এবং rk39 অ্যান্টিজেন strip ELISA Test করে। কখনও কখনও চামড়ায় অর্বুদ ও সংলগ্ন অংশের বায়োপসি নেওয়া হয়। PKDL রোগীকে মিলটেফোসিন একটানা বারো সপ্তাহ

রোজ খাওয়ানো হয়। বিংশ শতাব্দীতে PKDL রোগীকে স্টিবানেট ইনজেকশন ৩ থেকে ৪ মাস দেওয়া হত রোজ (৯০ থেকে ১২০ দিন—১০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দৈহিক ওজন হিসাবে প্রতিদিন মাংস পেশীতে বা শিরায়)। PKDL রোগীকে 'লাইপোসোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি' ৫% গ্লুকোজ দ্রবণে শিরার মাধ্যমে দিয়েও চিকিৎসা করা যায়। সপ্তাহে ২দিন করে ৩ সপ্তাহে মোট ৬ দিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। প্রতিদিন ডোজ ৫ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসাবে। সমগ্র কোর্স ৩০ মি.গ্রা./প্রতি কেজি হিসাবে। (৯) দেখা গেছে কালাজ্বর অধ্যুষিত অঞ্চলে এইচ.আই.ভি ও এইড্‌স্ রোগীরা কালাজ্বরে বেশী আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে এইচ.আই.ভি. রোগীদের সুনির্দিষ্ট ঔষধ ART (Antiretroviral therapy) দেওয়ার সাথে সাথে, কালাজ্বরের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই সব রোগীদের পুনরায় কালাজ্বর অসুখ হবার সম্ভাবনা খুব থাকে। সেই উদ্দেশ্যে এইচ.আই.ভি. রোগীকে কালাজ্বরের প্রকোপ হতে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্য প্রতিমাসে একবার মাত্র ১ মি.গ্রা./প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের 'লাইপোসোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি' ইনজেকশন শিরায় গ্লুকোজ দ্রবণের মাধ্যমে দেওয়া হয়। 'আম্ফোটেরিসিন বি' R. E. Cell-এর সাইটোপ্লাজমে বেশ কয়েক সপ্তাহ থাকে এবং, পরজীবী ধ্বংস করতে থাকে। (১০) বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ কালাজ্বর বিনাশকারী দুইটি বিভিন্ন ঔষধ একসাথে ব্যবহার করে কালাজ্বর নিরাময় দ্রুত সম্ভব হয়েছে। এতে উভয় ঔষধের ডোজও অনেক কম দরকার হয় এবং উভয় ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়। এইভাবে অ্যাম্ফো-বি+প্যারামোমাইসিন, অ্যাম্ফো বি + মিলটেফোসিন, মিলটেফোসিন + প্যারোমোমাইসিন অথবা স্টিবানেট + প্যারামোমাইসিন প্রয়োগ করে কালাজ্বরের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া গেছে।

ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রোগীদের সচেতন করতে হবে। এই রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত সমস্ত ডাক্তার ও নার্সদেরও এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

কালাজ্বর নির্মূলকরণের কর্মসূচী—নাতিশীতোষ্ণ দেশের (ট্রপিক্যাল কান্ট্রি) যেসব সংক্রামক অসুখে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ বসবাসকারী মানুষ আক্রান্ত হয় তারা সবাই দরিদ্র এবং অপুষ্টির শিকার। আর ঐ সব অসুখ হল 'অবহেলিত ট্রপিক্যাল অসুখ'। কালাজ্বর ও আরও প্রায় ১৭টি সংক্রামক ব্যাধি এই পর্যায়ভুক্ত। ২০২৩ সালে ভারতীয় গণনায়, বিহারে ১৪২ জন, ঝাড়খণ্ডে ৯৫ জন, পশ্চিমবাংলায় ৬৭ জন ও উত্তর প্রদেশ ১০ জন কালাজ্বর

রোগী পাওয়া গেছে। এছাড়াও প্রায় অনুরূপ সংখ্যা বা তার বেশী PKDL রোগী জনজীবনে বাস করছে। WHO, NTD, Roadmap Goal হল ২০৩০ সালের মধ্যে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়ার সাথে সাথে অন্যান্য ওইসব NTD নির্মূল করা। এর জন্য নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সারা দেশে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ব্লক মহকুমা ও জেলা-হাসপাতালে, মেডিকেল কলেজে নানান নির্দেশ পালন অতি তৎপরতায় করার কথা বলা হয়েছে। 'Kala-azar Fortnight'-এইরকম এক কর্মসূচীর মাধ্যমে কোন গ্রামে/অঞ্চলে একটি কালাজ্বর রোগী বা একজন PKDL রোগী পাওয়া গেলে রোগীদের চিকিৎসার সাথে সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঐ সব রোগী আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। সন্দেহ হলে rk39 অ্যান্টিজেন strip, ELISA করে ও চামড়ার পরীক্ষা অর্থাৎ চামড়ার রস নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং রোগীদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি রোগীর বসত বাড়ী ও তার চারপাশে চার বর্গমাইল অঞ্চলে গ্রামবাসীদের বসতবাড়ী, গোয়াল, ঠাকুর ঘরের ভিতরের দেওয়ালে ৬ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত DDT অথবা 'পাইরেথ্রাম' স্প্রে করা হয়। সাধারণত বছরে দুইবার স্প্রে করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাস হতে জুলাই মাস পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর দুই বার স্প্রে করা হয় (IRS−Indoor Residual Spray)। প্রথমবার স্প্রে করা হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, আর একবার মে মাসের প্রথমে, দেওয়ালের উপর স্প্রে করা কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব আড়াই মাস কাল মাত্র থাকে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের কালাজ্বর সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গ্রামের ও শহরের মানুষদেরও ছোটছোট সভা করে ব্যানার, বুকলেট ও রোগীর ছবির প্রদর্শন করিয়ে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের এই মারণরোগ সম্বন্ধে সচেতন করতে উপদেশ দেন। বসতবাড়ী ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে যাতে ঘরে যথেষ্ট সূর্যালোক প্রবেশ করে সেদিকে নজর দেওয়া। ঘরের ভিতরের দেওয়ালে মসৃণ পলেস্তারা ও প্রলেপ দেওয়া, গোয়াল ঘর বসত ঘর থেকে দূরে রাখা জরুরি। পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা করা এবং সে বিষয়ে শিক্ষাদান জরুরি। মাদক দ্রব্যের ও অন্যান্য নেশা থেকে তাদের দূরে থাকতে সচেতন করা হয়। আমরা আশাবাদী রোগের সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সর্বদা স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মত সহযোগিতাই আমাদের এই মারণ রোগ হতে মুক্ত করবে।

[লেখক প্রাক্তন অধ্যাপক, ট্রপিকাল মেডিসিন,
স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, কলকাতা।]

বিস্মৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কাজের চর্চা আগামীতেও চলবে

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্ত আশু বিপদগুলো বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে বাহক বাহিত সংক্রামক রোগের অর্থাৎ 'ভেক্টর বোর্ন ইনফেকসিয়াস ডিজিজ' গুলোর উত্থান অন্যতম। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, সারাবিশ্বব্যাপী খরা, অনিয়মিত বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মতো অনভিপ্রেত ঘটনাগুলো আগামীদিনে ঘটতে চলেছে। এর সঙ্গে পরিবেশে বিদ্যমান জৈব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন আসবে।

আগামী দশকগুলোতে ক্ষুদ্রপ্রাণী, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, আণুবিক্ষণিক জীবাণুদের খাদ্য, বাসস্থান এমনকি জীবনধারণই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এদের বাসস্থান পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশে পর্যাপ্ত বংশবিস্তার অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর জেরে, নতুন নতুন ভৌগোলিক পরিবেশে পোকা-মাকড় এবং বাদুড়ের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রয়েছে। সঙ্গে বাড়বে এদের দ্বারা বাহিত প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস-ঘটিত নানা সংক্রামক রোগ। এর ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানিজ এনকেফ্যালাইটিস, স্ক্রাব টাইফাসের মত এখনকার ত্রাস-সৃষ্টিকারী রোগগুলো ছাড়াও পীতজ্বর, কালাজ্বর ও প্লেগের মতো পুরনো সমস্যাগুলোও বাড়বার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তাই আগে থেকে এই সমস্ত রোগগুলোর মোকাবিলার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত, মত বিশেষজ্ঞদের।

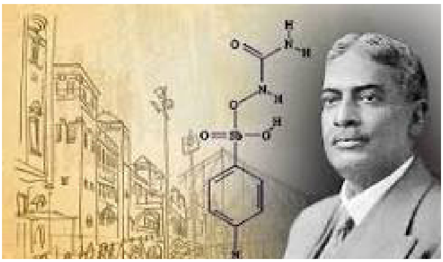

এই প্রেক্ষিতে একটি প্রায় ভুলতে বসা রোগ- 'কালাজ্বর' নিয়ে কিছু আলোকপাত করব, যা একসময়ে এক বিভীষিকা ছিল ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, তথা আমাদের বাংলায়।

বিগত শতকে কালাজ্বর ভয়াবহ মহামারীরূপে কয়েকবার আমাদের দেশের উপর আঘাত হেনেছে। ঘটে গেছে বহু অকাল মৃত্যু। আক্রান্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আজও আমরা কালাজ্বর সৃষ্টিকারী পরজীবীটিকে পুরোপুরি শায়েস্তা করতে পারিনি। পারিনি এই রোগটিকে সমূলে উৎখাত করতে। মহামারি আকারে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে এখনও পূর্বভারতে বিশেষতঃ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, ও পশ্চিমবাংলায় কালাজ্বরে আক্রান্ত হবার ঘটনা প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিষুব অঞ্চলে ভয়াবহতার নিরিখে ম্যালেরিয়ার পর পরজীবীঘটিত রোগগুলোর মধ্যে কালাজ্বরের স্থান দ্বিতীয়।

কালাজ্বর আসলে একটি এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ। এই পরজীবীটির নাম- 'লিশম্যানিয়া'। লিশম্যানিয়া কোনও সময়ে ত্বকের প্রদাহ, আবার কোনও সময়ে উদরের বিভিন্ন অঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করে। কালাজ্বরকে উদরের লিশম্যানিয়েসিস বলাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯০৩ সালে 'লিশম্যান' ও 'ডোনোভ্যান' নামের দুইজন বিজ্ঞানী একইসাথে যথাক্রমে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে কালাজ্বরের পরজীবীটি আবিষ্কার করেন। সেবছর ম্যালেরিয়া পরজীবীর আবিষ্কর্তা রোনাল্ড রস কালাজ্বর সৃষ্টিকারী পরজীবীটির নাম দেন 'লিশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি'।

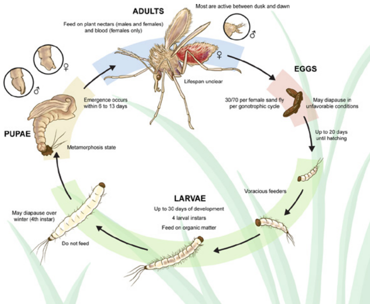

কালাজ্বর বিষুব অঞ্চলে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ কয়েকবার মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। কেবল ১৯৭৮ সালেই কালাজ্বরে আমাদের দেশে মোট কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৯১ সালে আবার ভয়াবহরূপে এটি দেখা যায় ভারত ও সুদানে। ভারতবর্ষে এই সময়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হন। ভারত ও সুদান মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ হাজার। সারা পৃথিবীতে এখনও প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়।

ভারতে কালাজ্বরের পরজীবী 'লিশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি' মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয় 'স্যান্ডফ্লাই' (বেলেমাছি) নামক একরকম মাছির মাধ্যমে, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম- 'ফ্লেবোটোমাস আর্জেন্টিপিস'। এই পরজীবীর জীবনচক্রের

একটি ভাগ (প্রোম্যাস্টিগোট অবস্থা) অতিবাহিত হয় এই প্রকার মাছির খাদ্যনালীতে, আর অপরভাগ (আম্যাস্টিগোট অবস্থা) আক্রান্ত মানুষের ম্যাক্রোফাজ কোষে।

কালাজ্বর আক্রান্ত মানুষের মধ্যে জ্বর, ক্ষুধামান্দ, আলস্যভাব ইত্যাদি নজরে এলেও যকৃত ও প্লীহার বড়ো হয়ে যাওয়াকে চিকিৎসকরা মূল রোগলক্ষণ বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত বলি, কালাজ্বর শব্দটি এসেছে কালা-আজার (kala-azar) শব্দটি থেকে। অসমিয়া ভাষায় azar শব্দের অর্থ জ্বর। এই জ্বর হলে রোগীর শরীরের রং কালো হয়ে যেত বলে রোগটিকে কালাজ্বর বলা হয়। অর্থাৎ রোগীর ত্বকের কালো রং এই রোগের আরেকটি লক্ষণ। ঠিকমত ওষুধ খেলে কালাজ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। বাজারে কালাজ্বরের ওষুধ সুলভেই পাওয়া যায়। লিশম্যানিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অ্যান্টিমনির যৌগ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' ব্যবহার করে সারা বিশ্বে যিনি হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তিনি হলেন বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এটা ডা. ব্রহ্মচারীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী।

ডা. ব্রহ্মচারী প্রকৃত অর্থে একজন বিস্মৃত অথচ 'জিনিয়াস' ভারতীয় বিজ্ঞানী। কালাজ্বর রোগের কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কারের সুবাদে তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্বকে সম্মান দেখাতে দু'বার (১৯২৯ ও ১৯৪২ সালে) তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই পুরস্কার তিনি পাননি। ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট ও রায় বাহাদুর উপাধি এবং কাইজার- ই-হিন্দ স্বর্ণপদক নিয়েই তাঁকে থাকতে হয়েছিল।

ডা. ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিহারের জামালপুরে। বিহারের জামালপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েতে কর্মরত চিকিৎসক ডা. নীলমনি ব্রহ্মচারীর সুপুত্র উপেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি জামালপুরে স্কুলের পাঠ শেষ করে হুগলির কলেজ থেকে গণিত ও রসায়নে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে একসাথে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে যথাক্রমে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক এবং রসায়ন নিয়ে স্নাতকত্তোর ডিগ্রি লাভ করেন। ডা. ব্রহ্মচারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শারীরবিদ্যা শাখায় পি.এইচ.ডি লাভ করেন।

১৯০৫ সালে ডা. ব্রহ্মচারী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমানে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ)-এ শিক্ষক-চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। তাঁর গবেষক জীবনের অনেকটাই এই মেডিক্যাল কলেজে অতিবাহিত হয়। কালাজ্বরের চিকিৎসার ওষুধও এই কলেজের গবেষণাগারে তিনি আবিষ্কার করেন।

১৯১৩ সালে ব্রাজিলের চিকিৎসক ভিয়ান্না কালাজ্বরের চিকিৎসায় টারটার এমেটিক রাসায়নিকের সফল প্রয়োগ করেন। টারটার এমেটিক অ্যান্টিমনি টারটারেটের একটি পটাশিয়াম সমন্বিত লবণ। ১৯১৫ সালে সিসিলিতে দুই চিকিৎসক (ক্রিশ্চিনা ও কোরটিনা) টারটার এমেটিক রাসায়নিক ব্যবহারের সাফল্য তুলে ধরেন। এই সময়ে কলকাতায় চিকিৎসক রজার্সও টারটার এমেটিক ব্যবহারে সফলতা পান। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, এই রাসায়নিক ব্যবহারে বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ডা. ব্রহ্মচারী প্রথমে পটাসিয়ামের বদলে এই রাসায়নিকে সোডিয়াম ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতেও সেভাবে সাফল্য এল না। এরপর তিনি ধাতব অ্যান্টিমনি ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এতেও পুরোপুরিভাবে ভাল ফল না পাওয়ায়, তিনি বিকল্প চিকিৎসার দিকে ঝোঁকেন। এই সময় ইউরোপে বিজ্ঞানী আর্লিক ‘স্লিপিং সিকনেস’ রোগের চিকিৎসায় প্যারা আর্সানিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সমন্বিত লবণ ব্যবহারে দারুণ সাফল্য পান। ডা. ব্রহ্মচারী ঠিক করেন, তিনি আর্সেনিলিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অ্যান্টিমনি ব্যবহার করবেন। সমকালীন সময়ে অনেকেই এই নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১৯-এ ডা. ব্রহ্মচারী তৈরি করেন ইউরিয়া স্টিবামিন। এটি একটি প্যারা অ্যামিনোফিনাইল স্টিরানিক অ্যাসিডের ইউরিয়া সমন্বিত লবণ। এই রাসায়নিকের ব্যবহারে ডা. ব্রহ্মচারী ব্যাপক সাড়া পান। কালাজ্বরের চিকিৎসায় ইউরিয়া স্টিবামিন মহৌষধি হিসাবে সামনে আসে। ভারতে ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত হাজার হাজার কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর প্রাণ বাঁচে। গরীব-গুর্বো মানুষের মৃত-সঞ্জীবনী হয়ে ওঠে ইউরিয়া স্টিবামিন। ১৯২১ থেকে ব্যবহার শুরু হয়।

১৯৩২ সালে তৎকালীন ভারত সরকার নিযুক্ত কালাজ্বর কমিশনের নির্দেশক কর্নেল এইচ.ই.সর্ট এই ওষুধটির ভূয়সী প্রশংসা ক’রে বলেন, ইউরিয়া স্টিবামিন গত সাত বছরে হাজার হাজার কালাজ্বর আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে।

জেনে রাখা ভাল, কালাজ্বর রোগটির সঙ্গে ডা. ব্রহ্মচারীর নাম জুড়ে গেলেও, তৎকালীন বেশ কয়েকটি সংক্রামক রোগের উপর তিনি সাফল্যের

সঙ্গে গবেষণা করেছেন। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস, ফাইলেরিয়াসিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ এবং সিফিলিস উল্লেখনীয়। কলকাতা ও ঢাকাতে আবির্ভূত কোয়ার্টান রোগের আবিষ্কার তিনিই করেন।

ডা. ব্রহ্মচারীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল, ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতেও তাঁকে দেখা গেছে। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা সংস্থা ও সমিতির সম্মানীয় পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডা. ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।

ডা. ব্রহ্মচারীর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলো, তাঁর দানশীলতা। বিভিন্ন গবেষণামূলক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর আর্থিক সহায়তায় উপকৃত হয়।

বস্তুতঃ কালাজ্বর হওয়ার ঘটনা বর্তমানে কয়েকটি অঞ্চলে আকস্মিকভাবে দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। যদিও বিগত দশকে ড্রাগ- রেসিস্ট্যান্ট লিশম্যানিয়ার উদ্ভব হওয়ায় কালাজ্বর রোগটির প্রকোপ কিছুটা মাথাচাড়া দিয়েছে। বর্তমানে এই রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে পেন্টাভ্যালেন্ট অ্যান্টিমনি সমন্বিত ওষুধ এবং পরবর্তীতে পেন্টামিডিন ও অ্যাম্ফটেরিসিন-বি কে কাজে লাগানো হয়।

সম্প্রতি দেওয়া সরকারি হিসাব মতে, সারাদেশে ২০০৭-এ যেখানে কালাজ্বরের সংখ্যা ছিল ৪৪,৫৩৩ সেখানে ২০২২-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৩৪-এ। অর্থাৎ এই রোগের হ্রাস ঘটেছে ৯৮.৭ শতাংশ। অনুমান, বেসরকারিভাবে করোনা কালের এই পরিসংখ্যান নিখুঁত ও যথাযথ নয়। তবে রোগীর সংখ্যা যে কমেছে, তা যথেষ্টই ইতিবাচক। এই মুহূর্তে কালাজ্বরের চিত্রটা কিছুটা স্বস্তি দিলেও জলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে যে স্বস্তিদায়ক থাকবে না, তা আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখার, ভবিষ্যতের এই চ্যালেঞ্জকে আগামী প্রজন্মের গবেষক ও নীতি নির্ধারকরা কীভাবে মোকাবিলা করেন। তবে একই সাথে আগামীতেও ডা. উপেন্দ্র ব্রহ্মচারীর কাজ যে আলোচনায় উঠে আসবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো]

কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি: সাফল্য ও কিছু সীমাবদ্ধতা

দীপঙ্কর মাজী

এক আদিবাসী ভদ্রলোক। বয়স ৪০এর কোঠায়। বাড়ি উত্তরবঙ্গের একটি অজ গ্রামে। প্রায় ৮-৯ মাস হয়ে গেল, অদ্ভুত একটা জ্বরে ভুগছেন। মাঝে মাঝে ২-৪ দিনের জন্য জ্বরটা ছেড়ে যায়। কিন্তু আবার ঘুরে আসে। জ্বরের মাত্রা বেশি হয়। কিন্তু শরীরটাকে একেবারে জখম করে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় না-পাশী ডাক্তারদেরই দেখিয়ে ওষুধপত্র খেয়েছেন। মাঝে একবার প্রতিবেশীর পরামর্শে বিহারে গিয়েও ডাক্তার দেখিয়ে এসেছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। এখন প্রায় শয্যাশায়ী। দিনমজুরির যে কাজ ওঁর, সেখানে নেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। হাত-পা ফুলে গিয়েছে। পেটটাও ফুলেছে। ইদানিং আবার খুব কাশি দেখা দিয়েছে।

অবশেষে এক স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শে, শেষ সম্বলটুকু বাঁধা দিয়ে, জেলা হাসপাতাল গিয়ে ভর্তি হলেন। সেখানে ধরা পড়ল—রোগটা কালাজ্বর! সঙ্গে বুকের টিবি এবং মারাত্মক অ্যানিমিয়া। চিকিৎসা শুরু হল। কালাজ্বরের ইঞ্জেকশানও পড়ল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভর্তির ৭-৮ দিনের মাথায় রোগীর মৃত্যু হল।

এমন ঘটনা আমাদের দেশে আজও ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর ৭৬ বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৯০-তে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরেও ৩৩ বছর চলে গেছে। তবু আজও এমন ঘটনা ঘটে।

কালাজ্বর অসুখটা প্রধানতঃ দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় প্রসার ঘটেছে। কালাজ্বর উপদ্রুত এলাকায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও রক্ত পরীক্ষা করে কালাজ্বর নির্ণয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। কালাজ্বরের চিকিৎসার আধুনিকতম ওষুধও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কালাজ্বরের প্রকোপ অনেকাংশে কমে এলেও মানুষের দীর্ঘ রোগভোগ এবং মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু আজও নির্মূল করা যায়নি।

দীর্ঘস্থায়ী জ্বর যে কালাজ্বরের লক্ষণ হতে পারে এবং তার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা যে গ্রামীণ হাসপাতালেই সম্ভব, ওই বিষয়ে প্রান্তিক মানুষের ধারণা এবং সচেতনতা ও সহজগম্যতার (access) আজও ঘাটতি রয়ে গেছে।

কালাজ্বরের জন্য জনস্বাস্থ্যমূলক ক্রিয়াকর্ম আমাদের দেশে শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ২ বছরের মধ্যেই নূতন রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুর ঘটনা অনেকটা কমে আসে। সেইসময় এই অসুখের চিকিৎসা হত সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে। নাম থেকেই আন্দাজ করতে পারবেন এটি একটি অ্যান্টিমনি-ঘটিত যৌগ (stibo=antimony) যা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইনেরই উন্নত বিকল্প।

২০০০ সালে নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরও গুছিয়ে শুরু করা হয়। ভারতের চারটি রাজ্যকে স্থায়ী-আক্রান্ত রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যথা—বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্য এছাড়া আরও কয়েকটি রাজ্যে অনিয়মিতভাবে কালাজ্বরের রোগী পাওয়া যায়। যেমন—আসাম, সিকিম প্রভৃতি। নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আক্রান্ত জেলা ও ব্লক বা মিউনিসিপ্যালিটিরও তালিকা তৈরি হয়। প্রথমোক্ত ৪টি রাজ্যের জন্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই রাজ্যগুলির সঙ্গে সীমানায় যুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলিও কালাজ্বর আক্রান্ত; অর্থাৎ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান।

আমাদের দেশে কালাজ্বরের দু'রকম রূপ দেখা যায়। একটি হল সাধারণ কালাজ্বর, যেটির কথা আগেই বলেছি। এখানে লিভার, প্লীহা (Spleen) ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ আক্রান্ত হয় এবং জ্বর দেখা দেয়। আর একটি হল ত্বকের কালাজ্বর যা সাধারণত সাধারণ কালাজ্বর থেকে সেরে ওঠার ১-৩ বছর পরে হয়। এক্ষেত্রে জ্বর বা কোনও অসুস্থতা হয় না। ত্বকে গুটি বা ফ্যাকাশে ছোপ ছোপ দাগ সৃষ্টি হয়। ত্বকের কালাজ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির থেকেও বেলে মাছির কামড়ের মাধ্যমে কালাজ্বর অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারে।

কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চলতে চলতে ২০১৪ সাল থেকে কেবল সাধারণ কালাজ্বর নয়, ত্বকের কালাজ্বর নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সক্রিয় চেষ্টা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে সাধারণ কালাজ্বর নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'নির্মূল'-এর মাপকাঠি হল : ব্লকস্তরে প্রতি ১০,০০০

জনসংখ্যা পিছু নতুন রোগীর সংখ্যা বছরে ১টিরও কম হবে। ২০১৫-র লক্ষ্যমাত্রা বিফল হলেও পশ্চিমবঙ্গ ২০১৭ সালে নির্মূলীকরণের এই মাত্রায় পৌঁছতে সমর্থ হয়। এর পরে উত্তরপ্রদেশও লক্ষ্যে পৌঁছয়। অবশেষে গত

বছরে ২০২৩এ চারটি রাজ্যই একই বন্ধনীতে আসে। এখানে নির্মূলের অর্থ এই নয় যে, অসুখটি আর কারও হচ্ছে না বা হবে না। এর অর্থ— কালাজ্বর সংক্রমণের মাত্রা কমে এমন জায়গায় আসবে যে অসুখটি আর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে থাকবে না। এবং বর্তমানে যারা সংক্রমিত, তাদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়ে ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে না।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি চলছে, তার ক্রিয়াকর্মগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া যাক।

(ক) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : ম্যালেরিয়া নির্ণয় যেমন আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট্-এর সাহায্যে সহজেই করা যায়, সাধারণ কালাজ্বরও আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে আর.কে. ৩৯ 'র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট'-এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কালাজ্বর আক্রান্ত জেলায় সব হাসপাতাল এবং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও এই পরীক্ষা হয়ে থাকে।

সাধারণ কালাজ্বরের চিকিৎসা এক দিনের একটি ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশানের দ্বারা করা যায়। তবে ত্বকের কালাজ্বরে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ৩ মাস ওষুধ খাওয়ার দরকার পড়ে।

(খ) রোগের নজরদারি : আশা (ASHA) এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সারা বছর ধরেই নজরদারি চলে। কিন্তু তাছাড়াও, বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে সক্রিয় রোগ সন্ধানে (Active Case Search) করা হয়—বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে। সার্ভে করে যাঁদের রোগী হিসাবে অনুমান করা হয় (Suspected case), তাঁদের মেডিক্যাল ক্যাম্পে এনে রক্তপরীক্ষা এবং ক্লিনিক্যাল চেক্-আপ করানো হয়। ত্বকের কালাজ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে টিস্যু পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) বেলে মাছি নিধনের জন্য স্প্রে : কালাজ্বরের বাহক যে বেলে মাছি, তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আক্রান্ত গ্রাম ও ওয়ার্ডগুলিতে বছরে

দুই বার বাড়ি বাড়ি বিশেষ একটি ইনসেকটিসাইড স্প্রে করা হয়। স্প্রে-টি করার নিয়ম ঘরের ভিতরে দেওয়ালে এবং গোয়াল ঘরে। কারণ, এই জায়গাগুলিতেই প্রায়শঃ বেলে মাছি দেওয়ালের ফাটলের ভিতরে আশ্রয় নেয়। আবার, মানুষ বা প্রাণীর রক্ত খাওয়ার পর দেওয়ালে বসেই বিশ্রাম নেয়। বাড়ির লোকেদের বলা হয় স্প্রে-র পরে অন্ততঃ ৩ মাস দেওয়ালে মাটি লেপা বা চুনকাম না করতে। তা না হলে ইনসেকটিসাইডের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

(ঘ) জনসচেতনা কর্মসূচি : কালাজ্বর অসুখটি কিভাবে সংক্রমিত হয়, কেমন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, অসুখটির লক্ষণ কী, চিকিৎসার সুযোগ কোথায় রয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয়।

(ঙ) আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি : যেহেতু প্রধানতঃ দরিদ্র মানুষই এই রোগের কবলে পড়েন। তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য এই কাজগুলি করা হয়।

• **চিকিৎসা সম্পূর্ণ করলে টাকা**—একজন দরিদ্র মানুষকে যেহেতু তাঁর দিনের রুজি বাদ দিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হয়, তাই চিকিৎসার কোর্স সম্পূর্ণ করলে ভর্তুকি হিসাবে দেওয়া হয় সাধারণ কালাজ্বরে ৫০০ টাকা এবং ত্বকের কালাজ্বরে ৪০০০ টাকা।

• **পুষ্টিকর খাদ্য**—প্রত্যেক কালাজ্বর রোগীকে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা মূল্যের পুষ্টিকর শুকনো খাবার দেওয়া হয় ৬ মাস ধরে।

• **যাতায়াতের খরচ**—চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য রোগী এবং একজন সহায়ককে গাড়ির খরচ দেওয়া হয়; গাড়ি ভাড়া করার খরচ বা গণপরিবহনে যাওয়ার খরচ, যেখানে যেমনটি দরকার। জেলার ভিতরে যাতায়াতের জন্য অনধিক ২০০০ টাকা এবং জেলার বাইরে কোনও হাসপাতালে যেতে হলে অনধিক ৫০০০ টাকা।

উপরোক্ত কর্মসূচি পালন করে কালাজ্বরকে বহুলাংশেই কমিয়ে ফেলা গেছে এবং দূরীকরণের লক্ষ্যরেখা ছোঁয়াও গেছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু অসুখটি বা রোগের পরজীবী জীবাণু ও তার বাহক তো একেবারে মুছে যায়নি। সজাগ নজরদারি এবং জনসচেতনতামূলক কাজ নিবিষ্টভাবে চালিয়ে না গেলে এই সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

[লেখক জনস্বাস্থ্যকর্মী]

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী – বিস্মরণে বৈজ্ঞানিক, বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক সাধনা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

শুরুর কথা

আজ থেকে প্রায় ১৮০ বছর আগে সেসময়ের মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান যিনি একাধারে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনের এমডি, বহু

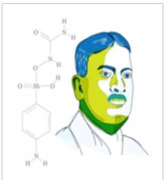

ভাষাবিদ, গবেষক এবং ভারতের IMS (Indian Medical Service)-এ স্থান পাওয়া প্রথম ভারতীয় সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় চিকিৎসকদের ভারতে বসবাস ও চিকিৎসা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন – "granting all the praise and honour due to hard-working and intelligent professors, the **European medical officers were at best birds of passage, and could not, therefore, permanently improve the position and prospects of the profession out of the service**." ("Address in Medicine: The Present State of the Medical Profession in Bengal (delivered on February 3rd, 1864)," *British Medical Journal* 2 (July-December 1864): 88) ফলে এসমস্ত "পরিযায়ী পাখিদের" বিকল্প হচ্ছে ইউরোপীয় জ্ঞানকে নিজেদের মতো করে আত্মীকরণ করে নেওয়া। একে আমরা যদি জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভ্রূণরূপ ধরি তাহলে মনে হয় গুরুতর কোন প্রমাদ হবে না।

পরাধীন ভারতে স্বাধীনভাবে গবেষণার চিন্তায় উজ্জীবিত বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন সেসময়ের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ-নেওয়া মারণান্তক অসুখ কালাজ্বরের সবচেয়ে ফলদায়ী চিকিৎসা – ইউরিয়া স্টিবামিন ওষুধ।

ব্রহ্মচারী ১৯৩৬ সালে ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন – "As a matter of the most vital concern in **nation-**

building, the problem of nutrition demands very careful consideration by statesmen and scientists alike, more so due to the fact, as has been recently observed, that a great part of the world's population is not consuming the **necessary food stuff**. An eminent Swiss authority predicts the decay of civilization unless there is a fundamental revision of the people's diet."

আমরা "নেশন-বিল্ডিং" শব্দটিকে খেয়াল করব। দেশ এবং জাতির গঠনে, ব্রহ্মচারীর ধারণানুযায়ী, রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জনকল্যাণী শক্তিকে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা – এসবের একটি যোগসূত্রে বিশ্বাস করেছিলেন ব্রহ্মচারী।

১৯৩৬ সালে যখন এ কথা ব্রহ্মচারী বলছেন সেসময় জাতীয়তাবাদী ভাবনার জোয়ারের কাল। এসময়ে, খুব অল্পকথায় বললে, ভারতে স্বাধীনতা আসবে কোন পথে এনিয়ে যেমন বিতর্ক চলছে, তেমনি চলছে স্বাধীন বা প্রাক-স্বাধীন ভারতে শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চার ধরন কেমন হবে এ নিয়েও বিভিন্ন মত ও পথের দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানচর্চার সাথে ভারতীয় উদ্যোগে স্বাধীন প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবসায়িক উদ্যোগ কোন পথে বিকশিত হবে – বিবিধমুখী এরকম বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ চেহারা দেখার আগে আমরা একবার দেখে নেব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই "জাতীয় শিক্ষা" নিয়ে কত পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কিভাবে পড়েছে পরবর্তী সময়ের চিন্তাজগতের ওপরে।

ইতিহাসের ধারায় ব্রহ্মচারী – বিস্মরণের অতীত ও বর্তমান

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের মান্য গবেষক রয় পোর্টার বলা যেতে পারে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস 'দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফিট টু ম্যানকাইন্ড' গ্রন্থে বলছেন – "In many villages and clearings where the white men took his wares and weapons, he encountered ghastly unknown conditions: *kala-azar*, with its leprosy-like symptoms, in India and Africa"। সে তো না হয় হল। ভারতে এবং আফ্রিকায় "বীভৎস অজানা পরিস্থিতির" মুখোমুখি হতে হয়েছিল রয় পোর্টারের নিজের দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। কিন্তু এর পরে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন পোর্টার – "Colonial powers, however, would see disease in one light only: an evil, an enemy,

a challenge, it had to be conquered in the name of progress." উপনিবেশিক শক্তি রোগকে এক শত্রু, এক আপদ এবং এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতো এবং ভাবতো এদের জয় করা আসলে প্রগতির নামান্তর। এখানে বলার কথা, হ্যাঁ, শুধু রোগের ক্ষেত্রে এ সমস্যা বিদ্যমান ভাবলে আমরা ভুল করবো। উপনিবেশের শ্রেষ্ঠ মেধাসমূহকেও আপদ, শত্রু এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে। হয়তো এ কারণে পোর্টার আবিষ্কারক হিসেবে রবার্ট কখ বা পল আর্লিখদের নাম তাঁর বইয়ে উল্লেখ করলেও *kala-azar*-এর আলোড়ন ফেলা চিকিৎসা ইউরিয়া স্টিবামিন বা এর আবিষ্কর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নামোচ্চারণ করেননি।

১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সভাপতির পূর্বোক্ত ভাষণে ব্রহ্মচারী বললেন – "বাস্তব কথা হল এই যে, একটি দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল পুষ্টির অভাব। একে রাষ্ট্রনেতা এবং বৈজ্ঞানিকদের উভয়ের তরফে অতি যত্ন সহকারে দেখতে হবে। এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত। একজন নামী সুইস (Swiss) গবেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যদি না পৃথিবীর মানুষকে খাদ্যের জোগান দেওয়া যায় তাহলে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এরকম মানুষ-মুখী মানসিকতা ছিল তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি।–

আমার এ নাতিদীর্ঘ গবেষণাকর্ম জাতীয় স্মৃতিতে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মরণে চলে যাওয়া (collective amnesia) চিকিৎসক-গবেষক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর আবিষ্কারের নানা বাঁক নিয়ে আলোচনা করেছি।

গবেষক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক তথা স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পরে বন্দিত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ "অবিচ্যুয়ারি" বিভাগে লেখা হয়েছিল – "By the death of Sir Upendranath Brahmachari in Calcutta on Feb. 6, India has lost one her outstanding figures. He was not only a distinguished Indian physician – perhaps the most distinguished of his day – **but also a research worker of unusual merit**." ল্যান্সেট জার্নাল বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একজন অসামান্য চিকিৎসককে হারিয়েছে তাই নয়, হারিয়েছে একজন অনন্যসাধারণ উচ্চমেধার গবেষককে। তাঁর গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করা হল – "His early researches on antileishmanial drugs, which culminated

in his preparation of **urea stibamine**, were financed by the Indian Research Fund Association.” সবার শেষে প্রতিবেদনে বলা হয় – “If all distinguished Indians, and for that matter **all British officials**, had shared his liberal outlook, **many of the difficulties India faces today would have been resolved**.” অর্থাৎ, যদি বিজ্ঞানের জগতে কেবল সমস্ত ভারতীয়ই নয়, ব্রিটিশ অফিসারেরাও যদি তাঁর মতো মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারতেন তাহলে ভারতের অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলা সম্ভব হত।

প্রসঙ্গত, ১৮২৩ সালে জন্ম নেওয়া ল্যান্সেট জার্নালে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক টমাস ওয়াকলে-র র‍্যাডিক্যাল বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছিল। বর্তমানে ল্যান্সেটের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ৬০-এর বেশি। ল্যান্সেট-এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় বলা হয়েছিল (অক্টোবর ৫, ১৮২৩) – “It has long been a subject of surprise and regret, that in this extensive and intelligent community there has not hitherto existed a work that would convey to the Public, and to distant Practitioners as well as to, Students in Medicine and Surgery, reports of the Metropolitan Hospital Lectures.” এই লক্ষ্যে “To Country Practitioners, whose remoteness from the head quarters, as it were, of scientific knowledge, leaves them almost without the means of ascertaining its progress – To the numerous classes of Students, whether here or in distant universities – To Colonial Practitioners – And, finally, to every individual in these realms.” – এদের সবার কাছে চিকিৎসার জগতের গবেষণা ও অগ্রগতির খবর পৌঁছে দিতে হবে। সম্পাদকের স্পষ্ট ধারণা ছিল এ কাজের জন্য “we shall be assailed by much interested opposition”।

আমরা বুঝতে পারছি, খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা আভিজাত্য এবং ঐতিহ্য-নির্ভর বিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মুক্ত চিন্তার এবং স্বাধীন গবেষণার বিরোধ – বিশেষত মেডিসিনের জগতে – বাহ্য একটি বিষয় ছিল। ১৯ শতকের প্রথমার্ধ অব্দি অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের মেডিক্যাল শিক্ষায় মেডিসিনের সাথে সাথে বাইবেলও পড়তে হত। এ বিষয়ে বিশেষ ভালো আলোচনা পাওয়া

যাবে জোয়ান লেন-এর সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ *A Social History of Medicine* এবং এন ডি জেউসন-এর অতি আলোচিত "Medical Knowledge and the Patronage System in 18th Century England" প্রবন্ধে।

এরকম অবস্থাকে ভাঙ্গার জন্য একদিকে যেমন জেরেমি বেন্থাম সহ অন্যান্য চিন্তাবিদদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন বা আদিতে লন্ডন ইউনিভার্সিটি (১৮২৬) তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য জন্ম নিয়েছে ল্যান্সেট তুল্য জার্নাল। অর্থাৎ, উপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার জগতে টানাপড়েন এবং দ্বন্দ্ব শুধু উপনিবেশিক-উপনিবেশিত এ দুয়ের বা দ্বিত্বতার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলনা। উল্লেখযোগ্য, উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্লীন থেকেছে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার দ্বন্দ্ব। এরই নিকৃষ্ট প্রতিসৃত চেহারা আমরা দেখেছি উপনিবেশিক ভারতে।

বিজ্ঞানের মাঝে এরকম স্তরায়িত দ্বন্দ্ব নিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রুনো লাতুরের *Science in Action: How to follow scientists and engineers through society* এবং টমাস কুনের *The Structure of Scientific Revolutions* সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক পড়ে থাকবেন আশা করি। এছাড়া সবার পরিচিত গ্রন্থ ডেভিড আর্নল্ড-এর কলোনাইজিং দ্য বডি এবং কপিল রাজের রিলোকেটিং মডার্ন সায়ান্স পথিকৃৎ স্থানীয়।

উপেন্দ্রনাথের (১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ – ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) জন্ম ও শিক্ষা বৃত্তান্তে প্রবেশের আগে আমরা বুঝে নিতে পারি তাঁর বেড়ে ওঠার সময়কালে উপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতির কিছু বিশিষ্ট রূপরেখা। কারণ চিন্তা তো সময়ের সন্তান – তা সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই হোক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা। সময় থেকে আলাদা করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এগুলোকে দেখা যায়না, দেখা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদ – তৎকালীন সময়ের বিশিষ্টতা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধ জয় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিলো। কিন্তু ১৮২৫ সালেই বিশ্ববাজারের অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড। এ বিষয়ে দ্য ইকনোমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা "The slumps that shaped modern finance" পড়ে নেওয়া যায়। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ

করে এসেছিল তা গভীর প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য ব্রিটেনের ধনাঢ্য শ্রেণিকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। এদিকে অস্ট্রেলিয়া চিন থেকে অনেক কমদামে চা কিনতো। কিন্তু ইংরেজরা কার্যত একটি ঘোরতর "চা-খোর" জাতি। এজন্য কমদামে ভালো চা পাওয়া ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া গুপ্তের গবেষণা দেখিয়েছে – "Evidence based on contemporary accounts suggests that a tradesman's family in 1749 in Britain spent three shillings a week for bread and four shillings on tea and sugar. But tea was still too expensive to become common man's drink. It was only in the nineteenth century that tea became a common beverage for British households. Per capita consumption per year increased from 1.1 pounds in 1820 to 5.9 pounds in 1900 and 9.6 pounds in 1931."

Table 1: Consumption of Tea: International Market Share

Year	Share in World Consumption (%)				
	United Kingdom	Rest of Europe	Russia/ USSR	North America (including West Indies)	Major Producing Countries
1910	39.2	4.2	21.0	18.3	4.4
1920	56.4	6.9	Not Available	18.1	6.6
1928	48.4	6.7	7.1	14.3	4.1
1936	53.5	6.3	3.1	14.2	9.3

Source: International Tea Committee, *Bulletin of Statistics*, 1946.

এরকম সময় দিয়েই শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ (১৮২৪-২৬)। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৫০,০০০ সৈনিক গারো পাহাড়, আসাম এবং মণিপুরের বিপজ্জনক দুর্ভেদ্য অঞ্চলে লড়াই করে মারা যায়। সেসময়ের হিসেবে ৫-১৩ মিলিয়ন পাউন্ড (বর্তমান হিসেবে ৪০০ মিলিয়ন থেকে ১.৪ বিলিয়ন পাউন্ড) ক্ষতি হয় যুদ্ধের ফলে। কিন্তু এ যুদ্ধের পরে দুটি ঘটনা ঘটে – (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চিনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের

অধিকার নাকচ করে, এবং (২) চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস, যিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে সফল এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে চা চাষ করা সম্ভব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। এরপরে আর বিশেষ সময় লাগেনি – আসাম ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর চা চাষের সুরক্ষিত অঞ্চল। এর সাথে সাথে বদলে গেল এসব অঞ্চলের টোপোগ্রাফি, ডেমোগ্রাফি এবং খাদ্যাভ্যাস। এই ব্রুস সাহেবকে "ভারতে চায়ের জনক"ও বলা হয়।

একইসাথে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর থেকে নদীয়া ও হুগলি হয়ে বর্ধমানে পৌঁছয় বেলেমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই-বাহিত মারাত্মক রোগ কালাজ্বর (যদিও এ রোগটি যে বেলেমাছি বাহিত সে আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে)। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে অল্পদিনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে যায় এই রোগ – পথে কোন জনপদ, গ্রাম বা লোকালয় এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

ইতিহাসে কুখ্যাত "বর্ধমান ফিভার" বস্তুত দুটি রোগের যুগপৎ আক্রমণে হয়েছিল। ব্রহ্মচারী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ১৯১১) তাঁর গবেষণাপত্র "On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever. (1854-75)"-এ দেখিয়েছিলেন – "It is thus evident that there was an epidemic of two diseases during the outbreak of Burdwan fever. The severe cases described by French were mostly cases of malaria (probably malignant tertian fever), while those that constituted the large majority of cases observed by Jackson were cases of Kala-azar."

১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর A Treatise on Kala-azar গ্রন্থে ব্রহ্মচারী জানাচ্ছেন – "কালা-আজার নামটি যদিও বহুল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যথোপযুক্ত নয়। এ নাম দিয়ে বোঝানো হয় যে এক বিশেষ ধরনের জ্বরে ত্বকের রঙ কালো হয়ে যায়। এজন্য অনেকেই মনে করেন একে "কালা-জ্বর" বলা উচিত।"

অঞ্চলভেদে কতভাবে এর নামের ভিন্নতা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি। ১৮২৪-২৫-এ যশোরে যখন এ রোগের প্রকোপ দেখা যায় তখন একে "জ্বর-বিকার" বলা হত। এরই অন্যান্য নামগুলো হল – "দমদম জ্বর", "সাহেবদের রোগ", "সরকারি অসুখ", "কালা-দুঃখ", "কালা-হাজার" "আসাম ফিভার", ponos (Greece), semieh (Sudan), malattia de

menssa (Sicily) ইত্যাদি। এসব থেকে কালাজ্বরের পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। জলপাইগুড়িতে একে বলা হত "পুষ্করা" আর আসামের মানুষ একে বলতো "সাহেবদের রোগ"।

যাহোক, আসামের সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা বাগান তৈরি হল, "সাহেবদের রোগ" ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো স্থানীয় অধিবাসী এবং চা বাগানের কুলি তথা শ্রমিকদের মাঝে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে লাগলো এই ব্ল্যাক ডেথ বা কৃষ্ণ মৃত্যুর থাবায়। তখন আড়কাঠিদের দিয়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে থেকে দরিদ্র, ভুখা মানুষদের নিয়ে আসা হল চা বাগানের কুলি হিসেবে। চা বাগান তৈরির মধ্য দিয়ে আগেই আসাম এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলের টোপোগ্রাফি পরিবর্তিত হয়েছিল। এবার নতুন করে ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন শুরু হল। আরেকটা পরিবর্তন হল – আসামের মানুষের মাঝে চা পানের অভ্যেস তৈরি করে দেওয়া হল। পরিবর্তন হল পানাভ্যাসেরও। ৩,৫০,০০০-এর বেশি মানুষ এ রোগে মারা গিয়েছিল। আবার কোন কোন হিসেবে এ সংখ্যা ২৫ লক্ষও হতে পারে। এ রোগে সেসময়ে মৃত্যুহার ছিল ৯০%।

উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এক গভীর সংকটের মুখে পড়লো – মানুষ তথা চা বাগানের কুলিদের মৃত্যু আটকানো না গেলে চা উৎপাদন হবেনা, মুনাফায় ঘাটতি পড়বে। আবার বিজ্ঞানীদের কাছে দুটি প্রশ্ন এলো – (১) এ রোগ কিভাবে হয়? বাহক কে? (২) মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যাবে কিভাবে। মেরি গিবসন তাঁর "The Identification of Kala-azar and the Discovery of *Leishmania donovani*" গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন – "In the years following 1858, when the British government formally assumed power over the whole of British India, the government of Bengal became concerned by reports of an epidemic of quinine-resistant fever occurring in the district of Burdwan in Lower Bengal. The mortality was so great that the population, the productivity of the land, and consequently the government **revenue were greatly diminished**."

এক অদ্ভুত সমাপতন ঘটলো – সাম্রাজ্যবাদ চায় মুনাফার জন্য কুলিদের বাঁচিয়ে রাখতে, এবং বিজ্ঞান চায় একটি মানুষেরও যেন মৃত্যু না ঘটে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সে লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শ্রম ঢেলে দেন। উপনিবেশিক শাসকেরা তার সুফলটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এটা বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি। শুধু তাই নয়

একটি "মেডিক্যাল-স্টেট-পলিটিক্স কমপ্লেক্স" গড়ে ওঠে। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির যূপকাষ্ঠে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বলি প্রদত্ত হন।

এর ভালো উদাহরণ দেখা যাবে ১৮৬৭-পরবর্তী উপনিবেশিক ভারতের কলেরা পলিসির ক্ষেত্রে। সুয়েজ খাল চালু হবার পরে কলেরা রোগী থাকলে জাহাজ শুদ্ধ কোয়ার‍্যান্টাইনে থাকা আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু এতে ইংরেজের মুনাফায় ঘাটতি পড়ছিল। এজন্য কলেরার সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হল, কলেরা ছড়ানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহ্য ধারণাকেও আক্রমণ করা হল, অস্বীকার করা হল। এ ব্যাপারে অনবদ্য সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন শেল্ডন ওয়াটস তাঁর "From Rapid Change to Stasis: Official Responses to Cholera in British-Ruled India and Egypt: 1860-1921" (*Journal of World History*, Vol. 12, No. 2 (Fall, 2001), pp. 321-374)। তাঁর পর্যবেক্ষণে – "To maintain general amnesia, they silenced critics at the Royal Army Medical College at Netley who knew what the score was. They kept inconvenient documentary evidence, written before the policy change, under wraps and in some cases may have destroyed it." **আরেকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ চিকিৎসক অ্যান্ড্রু ডানকান তাঁর "A Phase in the History of Cholera in India"** (১৯০২ সালে **এডিনবার্গ মেডিক্যাল জার্নাল**-এ প্রকাশিত) প্রবন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই বিপজ্জনক প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। "মেডিক্যাল-স্টেট-পলিটিক্স কমপ্লেক্স"-এর এর চাইতে ভালো উদাহরণ আর কি আছে?

১৮৬৭-৬৮ পরবর্তী সময়ে ভারতে কলেরা গবেষণার ক্ষেত্রে "পলিসি রিভার্সাল" বা নীতির আপাদমস্তক পরিবর্তনের ফলে শুধু কলেরা সংক্রান্ত গবেষণা নয়, সব শাখার স্বাধীন গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনিতেই পুঁজি এবং বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণায় উপনিবেশিক ভারতে উৎসাহ দেওয়া হত এমন নয়। এই সময়ের পরে তা আরও কমে যায়। এমনকি খোদ সাদা চামড়ার সাহেব রোনাল্ড রস তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্র বিভিন্ন পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে ব্রহ্মচারী "রাজভক্ত" ছিলেন কিনা (যে প্রশ্ন সম্প্রতি এক গবেষক তুলেছেন) এরকম এক প্রেক্ষিতে খুব জরুরি ছিলনা। অধিকতর জরুরি ছিল একজন কালা মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে যত যোগ্যতাই অর্জন করুন না কেন তিনি উপনিবেশিক

বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্রের সাথে কতটা লড়াই করে উঠতে পেরেছেন এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের জগতের ঘাঁৎঘোঁৎ ভালো বুঝতেন কিনা।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আমরা তার মাঝে খুঁজে দেখতে পারি অন্যভাবে। তাঁর নাম দুবার – ১৯২৯ এবং ১৯৪২ – নোবেলের তালিকায় নমিনেশন পাওয়া সত্ত্বেও কেন নোবেল পুরষ্কার পেলেন না। আর প্রথম ক্ষেত্রে এটা জেনে রাখা ভালো ইন্ডিয়া রিসার্চ ফান্ড থেকে অনুদান পাওয়ার দরুণ তাঁর আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামিনের বাজারে আসা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমানের নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) যে ঘরে এই অসম্ভব গবেষণাকর্মটি করেছেন সেটা আয়তনে জেলের একটা সেলের সাইজের বেশি কিছু ছিল না। তাঁর নিজের কথায় – "I recall with joy that memorable night in the Calcutta Campbell Hospital at Sealdah, where after a very hard day's work I found at about 10 o'clock that the results of my experiments were up to my expectations. But I didn't know then that providence had put into my hands a wondrous thing and that this little thing would save the lives of millions of my fellowmen. I shall never forget that room where Urea Stibamine was discovered. **The room where I had to labour for months without a gas point or a water tap and where I had to remain contented with an old kerosene lamp for my work at night**. To me it will ever remain a place of pilgrimage where the first light of Urea Stibamine dawned upon my mind." তাঁর গবেষণাকক্ষে কোন গ্যাসের সংযোগ ছিলনা, ছিলনা বিদ্যুৎ সংযোগ, এমনকি ট্যাপ ওয়াটারের সরবরাহও নয়। একটি পুরনো কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাত্রিবেলা কাজ করতেন আবিষ্কারের অদম্য আকাঙ্খায়।

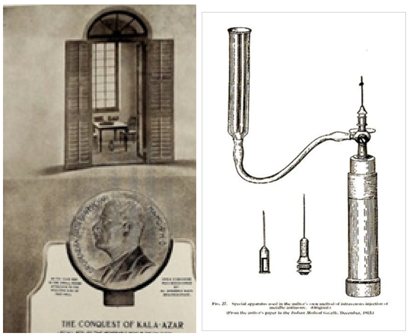

(যে ঘরে গবেষণা করতেন এবং ডানদিকে যে যন্ত্র দিয়ে রোগীদের দেহে ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন দিতেন)

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

যাঁদের ব্রহ্মচারীর মতো জীবন যাপন তাঁদের উপাধি হয় ব্রহ্মচারী। একটি কম সমর্থিত মত হল যে কেশবচন্দ্র ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন তাঁর বড়দাদা গোপালচন্দ্র ভারতী দীক্ষার পরে নিজেদের মুখোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি গ্রহণ করেন। এদের নবম বা দশম বংশধর হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

এক অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী এই মানুষটির গ্র্যাজুয়েশন ১৮৯৩ সালে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে – অংক এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে ডাবল অনার্স, Thysetes মেডেল পান। এরপরে ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে এমএ পাশ, সাথে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। একই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এলএমএফ ডিগ্রি পান ১৮৯৯ সালে। ১৯০০ সালে এমবি ডিগ্রি – মেডিসিন এবং সার্জারি দুটিতেই প্রথম হয়ে গুডিভ এবং ম্যাকলিওডস মেডেল পান। ১৯০২ সালে এমডি পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপরে ১৯০৪ সালে পিএইচডি অর্জন। বিষয় ছিল “Studies on Haemolysis”। তাঁর পিএইচডির থিসিসের সংক্ষিপ্ত এবং উন্নত চেহারার নতুন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় বায়োকেমিক্যাল জার্নাল-এ ১৯০৯ সালে “Some Observations on the Haemolysis of Blood by Hypoosmotic and Hyperosmotic Solutions of Sodium Chloride” শিরোনামে। এছাড়াও ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন থেকে Mente মেডেল এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোন্স মেডেল লাভ করেন।

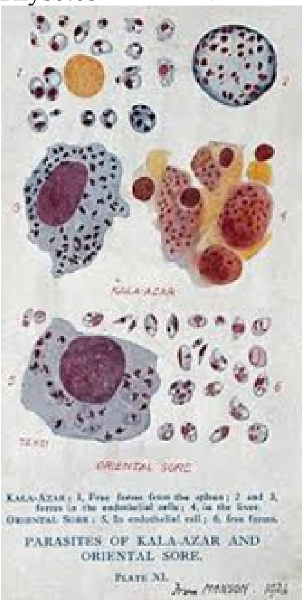

পরবর্তী সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে গবেষণার নির্ভুল লক্ষ্যে। প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে *নেচার, ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, বায়োকেমিক্যাল জার্নাল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ* বা *ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট*-এর মতো জার্নালগুলোতে।

১৯০৩ সালে ৩ মাসের ব্যবধানে দুটি ঘটনা ঘটলো। ৩০ মে, ১৯০৩-এ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল রয়্যাল আর্মি মেডিক্যাল কলেজের (নেটলে) প্রফেসর লিশম্যানের গবেষণাপত্র "On the Possibility of Occurrence of Trypanosomiasis in India"। ভারত থেকে "দমদম জ্বর" নিয়ে আগত এক ব্রিটিশ সৈন্যের প্লীহা থেকে ম্যালেরিয়া থেকে ভিন্ন একধনের পরজীবী দেখতে পেলেন। "In July 1903, Donovan reported the finding of similar bodies from the spleen of patients suffering from prolonged fever with splenomegaly in Madras (now Chennai)." রোনাল্ড রসের মতো নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব লিশম্যান এবং ডোনোভান দু'জনের আবিষ্কারকেই সম্মান জানিয়ে এই নতুন পরজীবীর নাম দেন *Leishmania donovani*। ব্রহ্মচারী যখন পিএইচডি করছেন তখন এই আবিষ্কারগুলো হচ্ছে।

১৯০৬ সালে ব্রহ্মচারী একটি গবেষণাপত্র লেখেন "On a Contribution to the study of Fevers due to Leishman-Donovan Bodies" (সি পি ঠাকুর, "হিস্টরি অফ কালা-আজার", WHO থেকে প্রকাশিত)। পরজীবী তো আবিষ্কার হল। কিন্তু একে মারা যাবে কি করে? এ হল তখন গবেষকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ৩০ মে, ১৯০৮, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল তাঁর গবেষণাপত্র – "Sporadic Kala-azar in Calcutta with Notes of a Case Treated with Atoxyl"। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল – "So far as my observations go, no drug can kill the parasites. I have used the following drugs without success: (1) Quinine internally; (2) Quinine hypodermically; (3) Fluorides; (4) Arsenic and some of its new preparations, such as Sodil cacodylas, Arrhenal, and Atoxyl; in some cases Arrhenal and Sodil cacodylas were given hypodermically; (5) Methylene blue internally; (6) Methylene blue hypodermically; (7) Izal in increasing doses; (8) Cyllin in increasing doses up to half a drachm* thrice a day." অর্থাৎ, সঠিক ওষুধটি তখনও অধরা। Atoxyl হল প্যারা-আরসেনিলিক অ্যাসিডের মনোসোডিয়াম সল্ট। সিফিলিস এবং স্লিপিং সিকনেসসের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আগে হয়েছে। কিন্তু অনেক বিপজ্জনক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল। এছাড়া আরেকটি ওষুধ নিয়ে তখন বেশ সোরগোল পড়েছিল – টার্টার এমেটিক বা অ্যান্টিমনিল পটাশিয়াম টার্টারেট। [*1 drachm=60 grains]

কিন্তু সবমিলিয়ে সম্মিলিত ফলাফলে ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। ১৯০৯-১০-এ বিশ্রুত বিজ্ঞানী পল আর্লিখ সিফিলিসের ওষুধ সালাভার্সান বা "ম্যাজিক বুলেট" আবিষ্কার করলেন। সালাভার্সান ছিল আর্সেনিকের যৌগ আর্সেফেনামিন। বলা হয় সালাভার্সান আবিষ্কারের সাথে সাথে কেমোথেরাপির যুগ শুরু হল।

তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সেসময়ে কালা জ্বরের জন্য চালু কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতেই তিনি পূর্ণত সন্তুষ্ট হননি, ভরসাও রাখতে পারেননি। ১৯১৩ সালে ব্রাজিলের চিকিৎসক গাস্পার ভিয়ান্না টার্টার এমেটিক (অ্যান্টিমনিল টার্টারেটের পটাশিয়াম সল্ট) দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। ১৯১৫ সালে সিসিলিতে ক্রিষ্টিয়ানা এবং কর্টিনা টার্টার এমেটিকের সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। কলকাতায় লিওনার্ড রজার্সও (স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন-এর তৎকালীন সময়ে সর্বময় কর্তা) টার্টার এমেটিকের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন টার্টার এমেটিকের দীর্ঘকালীন ব্যবহারে মারাত্মক সব ক্ষতিকারক দিক আছে। ব্রহ্মচারী ক্রমাগত অসন্তোষে ভুগছিলেন। যদি পটাশিয়ামের পরিবর্তে সোডিয়াম সল্টও ব্যবহার করা যায় তারও ক্ষতিকারক দিক যথেষ্ট।

ব্রহ্মচারীর মাথায় আসে আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনি পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে রয়েছে। এবং দুটি মৌলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল চরিত্রে অনেক মিল আছে। তিনি এবার অ্যান্টিমনি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। প্রথমে পাউডার তৈরি করে, পরবর্তীতে অ্যান্টিমনির কোলয়ডিয় (colloidal) দ্রবণ তৈরি করে। সফল হলেন। তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ল্যান্সেট পত্রিকায় (অক্টোবর ২১, ১৯১৬) "The Preparation of Stable Colloidal Antimony" শিরোনামে। তিনি জানালেন – "The remarkable trypanocidal properties possessed by antimony, its specific action against the Leishmania, and the fact that in the colloids generally the ratio dosis curativa : dosis tolerata is very low, make it desirable to prepare a stable solution of colloidal antimony." তাঁর শেষ কথা ছিল – "The colloid obtained in this way seems to be a very stable substance, and in this respect differs from the Svedberg's colloid. The therapeutic use of the colloidal metallic

antimony has already been described in the Indian Medical Gazette (May, 1916). Further observations on the **use of this drug in the same disease have shown similar beneficial results**.”

শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো যে আজকের যুগের ফেজ ১ ট্রায়ালের ছায়া তাঁর পরীক্ষায় ধরা আছে। এই গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন।

এরপরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এ ১৯২২ সালে “Chemotherapy of Antimonial Compounds in Kala-azar Infection” শিরোনামে। এখানে প্রতিটি যৌগের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। দেখালেন ইউরিয়া স্টিবামিন (carbostibamide) সবচেয়ে কার্যকরী, ফলদায়ক এবং কম সময়ে সুস্থ করে তোলে।

মিশন ইউরিয়া স্টিবামিন

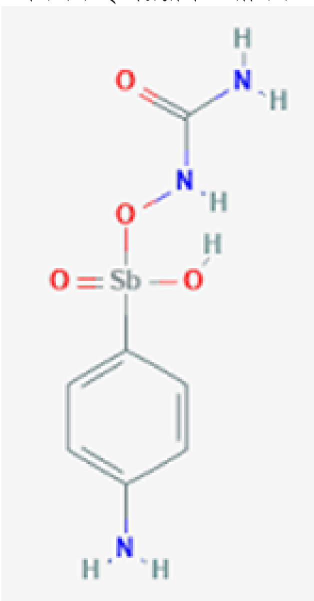

১৯৮৬ সালে *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical জার্নালে ফিলিপ মার্সডেন “The Discovery of Urea Stibamine”* (এপ্রিল-জুন, ১৯৮৬) *শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখান থেকে খানিকটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্রহ্মচারীর কাজকে চুম্বকে ধরতে সাহায্য করবে* – “He first synthesised several new inorganic antimonials and achieved some treatment success with colloidal metallic antimony which was taken up by the reticulo endothelial system. Dissatisfied with these results however he turned his attention to organic aromatic antimonials inspired by the idea that an antimonial having a constitution similar to atoxyl (which was found by Ehrlich to be effective in sleeping sickness) might prove useful in kala-azar. In 1919

supported by the Indian research fund he prepared P-Stibanilic Acid and various salts. In 1920 by heating Stibanilic Acid with urea he produced the first organic antimonial to achieve wide acceptance as a treatment for human leishmaniasis namely urea stibamine. The reason for this choice was that urea in combination with certain drugs reduces the pain on injection. Both Brahmachari and Shortt of the Indian Medical Service **found this drug to be extremely effective and safe in the treatment of kala-azar**."

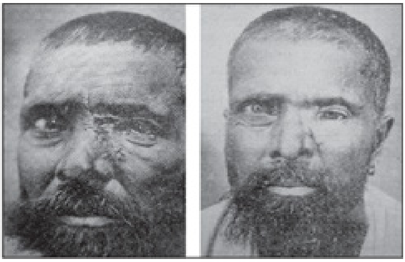

(বাঁ দিকে, চিকিৎসার আগে এবং পরে কালা জ্বরের রোগীর মুখমণ্ডল।)

এবার এই ওষুধের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হল আসামে – চা বাগানে, গ্রামে-গঞ্জে, লোকালয়ে এবং অন্যত্র। *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*-এ (৪ মে, ১৯২৯) "Preventive Medicine in Assam" শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হল – "In June, 1927, universal or mass treatment of all kala-azar patients with urea stibamine was instituted consequent on a marked reduction having been effected in the cost of this preparation; previously only 10 per cent of the patients had been so treated, the remainder having received the less effective **sodium in antimony tartrate**. **The change of treatment resulted at once in a most gratifying increase of cures** and a more regular attendance of patients at treatment centres."

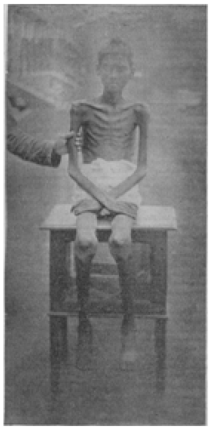

ডানদিকে, রোগের ফলে একেবারে শীর্ণ দশা – cachexia)

১৯৩২ সালে সরকারি কালা-জ্বর কমিশনের ডিরেক্টর এইচ ই শর্ট বললেন – "We found Urea Stibamine an eminently safe and

reliable drug and in seven years we treated some thousands of cases of Kala-azar and saw thousands more treated in treatment centers. The acute fulminating type characteristic of the peak period of an epidemic responds to treatment **extraordinarily promptly** and with an almost dramatic cessation of fever, diminution in the size of spleen and return to normal condition of health.” এরসাথে মাথায় রাখতে হবে ইউরিয়া স্টিবামিন ব্যবহারের আগে যেখানে মৃত্যুহার প্রায় ৯০% ছিল, এ ওষুধ ব্যবহারের পরে তা বদলে গিয়ে সুস্থতার হার ৯০%।

ওষুধের পেটেন্ট এবং বিপণন

ভারতীয়দের (অন্তত সেসময়ের একদিকে জাতীয়তাবাদী প্রভাব, অন্যদিকে প্রাচীন সমাজের প্রভাবে) মধ্যে আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঔদাসিন্য লক্ষ্য করা যায়। জগদীশ বসু এর প্রোজ্জ্বলন্ত উদাহরণ। এর জন্য নোবেল প্রাইজ থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। ওষুধের পেটেন্ট নিলেন না বা আদৌ গা করেননি। এর ফলে বিভিন্ন কোম্পানি এরকম ফলদায়ী ওষুধ নিয়ে নিজেদের মতো করে বানিয়ে (ব্রহ্মচারীর ফর্মুলা অনুযায়ী নয়) বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। এরকম একটি কোম্পানি ছিল ইউনিয়ন ড্রাগ কোং। হাই কোর্ট অব্দি মামলা গড়ায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ (জুন, ১৯১৬) প্রকাশিত হয় “Urea Stibamine” শিরোনামে। এর প্রতিবেদনে বলা হয় – “**He gave the process of manufacturing to the world**, but reserved the name ‘Urea Stibamine’ as a fancy or trade designation, for his own private manufacture and share of the drug.” এখানেই ইউরো-আমেরিকান বাণিজ্য বুদ্ধির সাথে ভারতীয়দের

পার্থক্য। শেষ অব্দি হাই কোর্টের বিচারপতি সি সি ঘোষের রায়ে ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ স্বত্ব পান। বাথগেট কোম্পানিকে দেন ওষুধ বিক্রির অধিকার।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লেখিত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের সর্বময় কর্তা সাদা চামড়ার শাসক লিওনার্ড রজার্স কালা চামড়ার উচ্চতর মেধাকে স্বীকার না করতে পারার জন্য ক্রমাগত ব্রহ্মচারীর বিরোধিতা করে গেছেন – কি গবেষণার ফলাফল নিয়ে, কি আন্তর্জাতিক দরবারে গবেষণাকে লঘু করে। এমনকি রজার্সের তীব্র বিরোধিতা ছিল অন্যতম একটি কারণ যে জন্য ব্রহ্মচারী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবেও নির্বাচিত হতে পারেননি।

উল্লেখ করা দরকার কালাজ্বর, কলেরা, স্মল পক্স ইত্যাদি একের পর এক মহামারির মুখোমুখি হওয়া উপনিবেশিক এবং বিজ্ঞানের কেন্দ্র লন্ডনের মেডিক্যাল থিওরির মাঝে প্রতিসরণ ঘটেছে – উভয়ত। কেন্দ্র দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই সেটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে। এখানেই বিরোধ বেঁধেছিল উপনিবেশিক কেন্দ্রের প্রতিনিধি রজার্সের সাথে প্রান্তের বিজ্ঞানী ব্রহ্মচারীর। অ্যালান বিউয়েল তাঁর *Romanticism and Colonial Disease* গ্রন্থে বলছেন – "There was a mutual refraction of colonial and metropolitan medical theory. The framing of "tropical disease" was thus not easily separated from the framing of the diseases of the urban poor"। অর্থাৎ, উপনিবেশের মেধাকে "অপর" এবং "আপদ" হিসেবে দেখা নিজেদের দেশের শহরের গরীবদের "অপর" দেখার মাঝে সঙ্গতি ছিল।

যাহোক, *নেচার* জার্নালে (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৩৯) লিওনার্ড রজার্সের (যিনি ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি ছিলেন) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল "The Antimony Treatment of Kala-azar" শিরোনামে। এ প্রতিবেদনে অনেক তথ্যের মাঝে একবার ছুঁয়ে যাওয়া হল যে "The first of these was introduced (and **patented**) by Dr. U. N. Brahmanchari in Calcutta in 1921, under the name of urea stibamine. This proved less toxic and more effective, and it enabled more than 90 per cent of cases to be cured by intravenous injections within a few days"। আজকের অ্যাকডেমিক পরিভাষায় একে বলা হয় relativization – অর্থাৎ, কোন উপায়ে মূল বিষয়কে লঘু করে দেওয়া। এ প্রতিবেদনেই পরে লিখলেন –

"according to Napier, who in 1925 found a course of stibosan to cost £2 *5s.* and one of urea stibamine £3 – a prohibitive sum for poor villagers in India."

মনে হয় দুরভিসন্ধি থেকে দুটি ভুল বা মিথ্যে তথ্য আন্তর্জাতিক গবেষক মহলে তুলে ধরলেন রজার্স – (১) ইউরিয়া স্টিবামিনকে "পেটেন্টেড" বললেন, যা কখনই ছিল না, এবং (২) ইউরিয়া স্টিবামিনের প্রতিটি ডোজের খরচ সেসময়ের হিসেবে ৩ পাউন্ড বলে দেখালেন।

এরপরে *নেচার*-এ (এপ্রিল ৬, ১৯৪০) পত্রিকার তরফে প্রকাশ করা হল একটি ছোট রিপোর্ট "Antimony Treatment of Kala-azar" শিরোনামে। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হল হল "He (Brahmachari) states that, contrary to Sir Leonard Rogers' statement, **urea stibamine was not patented**." আরও বলা হল – "Sir Leonard Rogers stated in his article that a course of treatment with urea stibamine costs £3 in 1925." কিন্তু বাস্তবে "Sir Upendranath states that urea stibamine is now supplied by the Government **at Rs. 1 per gram, and since 1·5 gm. is sufficient for complete cure, the total cost of the drug to-day is now Rs. 1. 8 (about 2s. 3d.)**." *নেচার*-এর উপসংহারে বলা হল – "Yet this cost is still relatively high for a country in· which the great majority of the population live dangerously near the starvation line, and there is still room for a rapidly effective and really cheap remedy for kala-azar."

আমরা শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো সরকারের লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মুনাফার জোগানদার শ্রমিকেরা এই রোগে উজাড় হয়ে গেলেও রাষ্ট্রের তরফে পাব্লিক হেলথের কোন প্রোগ্রাম উপনিবেশিক সরকারের তরফে ছিলনা। এরকম প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসার দায় রোগীর নিজের। আজকের ভারতবর্ষে সার্বজনীন টিকাকরণ নিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে পলিসি পঙ্গুতা তার মধ্যে কি সেদিনের কোন ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি?

নেচার-এর সংবাদের অনেক আগে ডবল্যু এইচ গ্রে এবং জে ডবল্যু ট্রেভান-এর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *Transactions of the Tropical Medicine and Hygiene*-এ (১৫ অক্টোবর, ১৯৩১)। সেখানে ব্রহ্মচারীকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় – "The first of them to achieve clinical success

in India was "urea stibamine," prepared by BRAHMACHARI (1922) by the action of urea upon *para-amino*phenylstibinic acid (stibanilic acid). Its nature, however, was the **subject of controversy**." ওষুধটির পেটেন্ট না নেবার জন্য যে যার ইচ্ছেমতো উপাদানে অতি কার্যকরী ইউরিয়া স্টিবামিন তৈরি করে বাজারে আনে। একজন ভদ্রলোকের মতো ব্রহ্মচারী এর উত্তর দিয়েছিলেন *নেচার*-এ (জুন ২৯, ১৯৪০)। সেখানে তিনি বলেন—"the divergent results obtained by different investigators were due to the fact that various manufacturers put on the market so-called urea stibamine **which did not conform to my specifications**" ("Chemistry of Urea Stibamine")।

ওষুধটির পেটেন্ট না নেবার জন্য ওষুধটি বাজার থেকে হারিয়ে গেল। এখন আর এ ওষুধ তৈরি হয়না। শুধুমাত্র ওষুধ হারালো না হারিয়ে গেল জ্ঞানের জগতের একটি অনন্য শাখাও। অথচ এখনও ২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী কালাজ্বর "neglected tropical diseases"-এর মধ্যে ২য় প্রাণঘাতী রোগ। ৭০টি দেশের ২ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। ল্যান্সেট-এ ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে – "An estimated 0·7–1 million new cases of leishmaniasis per year are reported from nearly 100 endemic countries." ("Leishmaniasis", আগস্ট ১৭, ২০১৮) *PLoS Tropical Neglected Disease*-এ প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে ৯৮টি দেশের ৩৫ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছে। ("Prevalence of *Leishmania* infection in three communities of Oti Region, Ghana", ২৭ মে, ২০২১) আরেকটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে প্রায় ৭০,০০০ মানুষ প্রতিবছর এ রোগে আক্রান্ত হয়।

বেদনা বিধুর নোবেল কাহিনী

১৯২৯ সালে নোবেলের জন্য ভারত থেকে নমিনেশন পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। কিন্তু কে ছিলেন তাঁর প্রস্তাবক? প্রস্তাবক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক সুধাময় ঘোষ। আন্তর্জাতিক মহলে কে চেনে তাঁকে? ফলে ব্রহ্মচারী নোবেলের জন্য নির্বাচিত হলেন না। কিন্তু নোবেলজয়ী সি ভি রমন আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং যোগাযোগের এই পরিসরটি বিলক্ষণ বুঝতে

পেরেছিলেন। এজন্য ১৯৩০ সালে তিনি যখন নোবেল প্রাইজ পান তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ৬ জন আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে নিলস বোর, রিচার্ড ফেইফার, ডি ব্রগলির মতো নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা ছিলেন। একই বছরে মেঘনাদ সাহা নমিনেশন পেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ডি এন বোস এবং শিশির মিত্র, যাদের আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রায় কিছুই ছিল না। মেঘনাদ সাহাও নোবেল প্রাইজ পাননি।

ব্রহ্মচারীর গবেষণা ১৯২৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছিল। বিজ্ঞানের জগতে এ এক পরম প্রাপ্তি। আমরা যদি এর পাশে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য ১৯৯০ সালে নোবেলজয়ী জোসেফ মারের কথা স্মরণ করি তাহলে আরেকটু বোধগম্য হবে বিষয়টি। জোসেফ মারে কোন তাত্ত্বিক কাজ করেননি। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীতে প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। কয়েক কোটি মানুষের জীবন বেঁচেছে। সমধর্মী কাজ ব্রহ্মচারী করেও নোবেল থেকে বঞ্চিত। ১৯৪২ সালেও ব্রহ্মচারী নমিনেশন পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল জয় হয়নি।

The Imperial Society of Knights Bachelor

Know all men by these Presents that His Majesty's Secretary of State for the Home Department having notified unto this Society that on the First day of March One thousand nine hundred and thirty five, His Majesty was pleased to confer the Dignity of Knighthood upon

RAI BAHADUR UPENDRANATH BRAHMACHARI

অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ১৯৩৭ সালে তাঁকে নাইটহুড দেওয়া হয়।

সংযোজন

এপ্রিল, ১৯১১-তে এশিয়াটিক সোসাইটির মেডিক্যাল সেকশনে একটি পেপার পাঠ করলেন – “On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever. (1854-75)” শিরোনামে। এই পেপারটি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এর সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সংখ্যায় হুবহু প্রকাশিত হল। এখানে তাঁর নিজের যুক্তিবিন্যাস, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক রিপোর্টের পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত হিসেবে জানালেন – “It is thus evident that there was an epidemic of **two diseases during the outbreak of Burdwan fever**. The severe

cases described by French were mostly cases of **malaria** (probably malignant tertian fever), while those that constituted the large majority of cases observed by Jackson were cases of **Kala-azar**." অর্থাৎ "বর্ধমান ফিভার" প্রকৃত পক্ষে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের যুগপৎ উপস্থিতির ফলে হয়েছে।

এই পেপারে তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল – "The epidemiology of malaria seems, therefore, to have been closely connected with that of Kala-azar in the Burdwan epidemic. This fact is not purely of academic interest, but will be of greatest value to those who are concerned with the study of Epidemiology of Malaria in Bengal. **Whether there was a causal relationship between the two diseases is a subject of the greatest interest to the scientific enquirer**."

এখানেও তাঁর সিদ্ধান্তের ভরকেন্দ্রে থাকল মেডিসিনের গবেষণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – (১) এই জ্বরের চরিত্র সঠিকভাবে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক আগ্রহের জন্য নয়, ম্যালেরিয়ার এপিডেমিওলজি বোঝার জন্য প্রয়োজন, এবং (২) ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর এই দুটি রোগের আন্তঃসম্পর্ক বোঝা একজন বিজ্ঞান অনুসন্ধানীর কাছে সর্বোচ্চ আগ্রহের বিষয়।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের ভাবায় তা হল, ১৯১৬ সালে ইউরিয়া স্টিবামিনের মতো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়ে যাবার পরেও ক্ষণজন্মা অতুল প্রতিভাধর সুকুমার রায়ের চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহার করা হল'না কেন? সুকুমার রায় মারা যান ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩-এ। তাহলে কি চা বাগানের কুলিদের ওপরে যে ওষুধের প্রয়োগ অবিশ্বাস্য ফল দিয়েছিল, কয়েক হাজার মানুষকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সে ওষুধ সেসময়ের কলকাতার 'এলিট' ডাক্তারদের মধ্যে এবং সমাজে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি? আমরা কি প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে চিরকালই পরাঙ্মুখ ছিলাম? অন্তত বাস্তব ইতিহাস তো সে কথাই বলে।

যাহোক, কলকাতায় প্রথম ব্লাড ব্যাংকের (পৃথিবীতে দ্বিতীয়) প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ – ১৯৩৯ সালে। তিনি ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের মতো সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীও ছিলেন। কলকাতা তথা ভারতে প্রথম ব্লাড ট্রান্সফিউসনের জনকও তিনি। কালাজ্বর ছাড়াও

ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভার, সেরেব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস, ডায়াবেটিস, সিফিলিস এবং ফাইলেরিয়াসিস নিয়ে গবেষণাকর্ম রয়েছে। তাঁর প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়কাল জুড়ে।

তাঁর জন্মের ১৫০ বছর পরে আমার মতো একজন সাধারণ নগণ্য চিকিৎসকের এ প্রবন্ধটি হল সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য – একজন অসামান্য আবিষ্কারকের সম্পূর্ণ বিস্মরণে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস।

[লেখক স্বাস্থ্য-গবেষক]

কালাজ্বর নিয়ে বিশ্ব সংস্থা

- বছরে ১০ লক্ষের মত নতুন কালাজ্বর রোগী পাওয়া যায় যাদের একাংশের মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়।
- দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মূলত ভিসেরাল লিসম্যানিয়াসিস এবং কিছু ক্ষেত্রে কিউটেনিয়াস লিসম্যানিয়াসিস দেখা যায়।
- ভিসেরাল লিসম্যানিয়াসিসের ফল হিসাবে চামড়ায় লালচে ছোপ ও ফুসকুড়ি বা ছোট ড্যালার মত দেখতে সাধারণত মুখমণ্ডল, উর্ধবাহু ও দেহকাণ্ডে পোষ্ট কালাজ্বর ডারমাল লিসম্যানিয়াসিস বা পি.কে.ডি.এল. রূপে দেখা যায় ৫-১০% ক্ষেত্রে।
- সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশ ও পূর্ব আফ্রিকায় পি.কে. ডি.এল. দেখা যায়। ব্রাজিলে কালাজ্বর—এইচ.আই.ভি. যুগ্ম রোগে এটি দেখা যায়।
- পি.কে.ডি.এল. থেকে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল।

কালাজ্বরের গল্প এবং বরেণ্য বাঙালি চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ

বাপ্পাদিত্য রায়

গল্পের শুরুঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অবহেলিত মনীষা; বিশিষ্ট চিকিৎসক, গবেষক ও বিজ্ঞান সাধক; কালান্তক কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারক এবং বাংলার অত্যন্ত মেধাবী ও বরেণ্য সন্তান ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মের সার্ধ শতবর্ষে (১৮৭৩ – ১৯৪৬ খ্রি.) তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে একটি অকিঞ্চিৎকর গল্প।

চিকিৎসক পিতার কাছে অতীতের কালান্তক কালাজ্বরের নানারকম কাহিনী, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন অব্যর্থ ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার, আরেক বাঙালি মনীষা সুকুমার রায়ের কালাজ্বরে অকালমৃত্যুর কথা অনেকবার শুনলেও এম.বি.বি.এস. স্তরে সেভাবে কালাজ্বরের রোগী দেখার সুযোগ হয়নি। বরং এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে মেডিসিনে হাউসস্টাফশিপ করার সময়ে ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে কালাজ্বরের কয়েকজন রোগীকে দেখেছি। এরপর 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে' ডি. পি.এইচ. করার সময় 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে' ক্লাস করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন কালাজ্বরের রোগীকে দেখি। চেন্নাইয়ের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি'-তে থাকার সময় আমরা বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এ কালাজ্বর নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিয়ে সমৃদ্ধ হই। পরে পাটনার আর.এম.আর.আই.এম.এস. পরিদর্শনের সময় ওয়ার্ড ভর্তি কালাজ্বরের রোগী দেখতে পাই। আর সেখানে ইনস্টিটিউটের সামনে দেখতে পাই ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবক্ষ মূর্তি।

চুম্বকে কালাজ্বরঃ কালাজ্বর একটি অবহেলিত ক্রান্তীয় রোগ (Neglected Tropical Disease) যার সাথে সরাসরি দারিদ্র, অপুষ্টি, সঠিক বাসস্থানের

অভাব ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই রোগটি বিভিন্ন নামে মানব সমাজে ছিল ও আছে। দীর্ঘদিন এই রোগে ভুগলে গায়ের ত্বকের রং কালো হয়ে যায় সেই কারণে আমাদের অঞ্চলে কালো জ্বর, আর সেখান থেকেই বোধহয় কালাজ্বর (Black Fever বা Kala–azar) নামটি এসেছে। বিশ্বে ৯৮ টি দেশে কালাজ্বর পাওয়া যায় যার মধ্যে ভারতে রোগীর সংখ্যা সবচাইতে বেশি। তারপর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আরও ১২ টি দেশে। কালাজ্বরের বৈজ্ঞানিক নাম Leishmaniasis। ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং নেপাল ও বাংলাদেশে Visceral Leishmaniasis (VL) ও Post Kala-azar Dermal Leishmaniasis (PKDL); পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাতে Cutaneous Leishmaniasis (CL) এবং রাজস্থানে Mucocutaneous Leishmaniasis (MCL) দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা বিশেষত তাদের সৈন্যরা যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ক্রান্তীয় সংক্রামক রোগগুলিতে আক্রান্ত হত তার অন্যতম ছিল কালাজ্বর। সেই সময় গঙ্গা – ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সাথে শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য কালাজ্বরে ভুগত। মৃত্যু হার ছিল ৯০ %। অসমের চা বাগান, অবিভক্ত বাংলার যশোর ও বর্ধমান জেলা, দমদমের সৈন্য ব্যারাক, ওড়িশা প্রভৃতি ছিল কালাজ্বর সংক্রমণের একেকটি কেন্দ্র।

কালাজ্বরের কারণ অনুসন্ধান ও ওষুধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান মিলিটারি সার্ভিসের ব্রিটিশ চিকিৎসকরা নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। জানা গেল বুনো জন্তু, শেয়াল, কুকুর, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি কালাজ্বরের জীবাণুর, যা এক ধরনের আদ্যপ্রাণী বা Protozoa, ধারক (Reservoir)। *Phlebotomous argentipes* নামক এক ধরনের ক্ষুদ্র বেলে মাছি (Sand Fly) এর বাহক (Vector)। এই নিশাচর রক্তভুক বেলে মাছিরা মাটির ঘর ও গোয়াল ঘরের মেঝে ও দেওয়ালের ফাটলে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। তারা লাফিয়ে চলে এবং ৫০ থেকে ১০০ মিটার অবধি যেতে পারে। তাদের কামড়ের মাধ্যমে প্রোটোজোয়ার Flagellated Promastogotes

form মানুষের দেহে প্রবেশ করে Reticulo - endothelium System-কে গ্রাস করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলে। Macrophage এর মধ্যে জীবাণু গুলি Amastogote form-এ থেকে যায়। রক্তের লোহিত ও শ্বেত কণিকা কমে যায়। জীবাণুর শরীরে প্রবেশ থেকে পূর্ণাঙ্গ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে (Incubation Period) এক থেকে চার মাস কখনও কখনও এক বছর লাগে। প্রবল জ্বর, লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ, রক্তাল্পতা, যকৃত ও প্লীহার বৃদ্ধি, অপুষ্টি, ওজন হ্রাস, ত্বকের রঙের কালচে পরিবর্তন ইত্যাদি VL কালাজ্বরের উপসর্গ (Symptoms) ও লক্ষণ (Signs)। ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গে জটিলতা ঘটিয়ে মৃত্যু হয়।

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডাঃ লিশম্যান এবং ডাঃ ডোনোভান পৃথকভাবে প্রোটোজোয়াটি আবিষ্কার করায় সেটির নামকরণ হয় *Leishmania donovani* । ওই সার্ভিসের ডাঃ রোনাল্ড রস, যিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরষ্কার পান, গবেষণা চালিয়ে লিশম্যান ও ডোনোভানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা চালিয়েও ব্রিটিশ চিকিৎসক গবেষকরা কালাজ্বরের কার্যকর ওষুধ বের করতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চার বছর শিক্ষকতা করে ডাঃ ব্রহ্মচারী কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) যোগ দিয়েছেন। পরাধীন দেশের যাবতীয় ঔপনিবেশিক অবহেলা ও বাধা এবং ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবের মধ্যেও তিনি একটি ছোট ঘরে সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন যৌগ কাজে লাগিয়ে তিনি কালাজ্বরের কার্যকর ওষুধ বের করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অবশেষে ১৯১৬-তে প্রস্তুত করলেন Urea Stibamine (Carbostibamide)। এখানে ঠিকমত পরীক্ষা করারও সুযোগ ছিল না, যেতে হল অসমের চা বাগানের 'কুলি কামিনদের' বস্তিতে। ১৯২০ নাগাদ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন অব্যর্থ ওষুধের আংশিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কারণ ব্রিটিশরা একজন নেটিভ

ডাক্তারের আবিষ্কার মেনে নিতে পারছিল না। অথচ তাঁর ওষুধ ছিল ৯০ % কার্যকর এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে তুলল। হিমালয়ের ওপারে চিনেও তাঁর ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা শুরু হল। ১৯২২ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন Dermal Leishmaniasis (এখন যাকে PKDL বলা হয়)। এই কালজয়ী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষকের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গল্পের পরের অংশঃ জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিগুলির প্রাথমিক সাফল্যের পর শিথিলতার কারণে গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ –'৯১ থেকে

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তর প্রদেশের ৫৪ টি প্রাদুর্ভাবপূর্ণ (Endemic) জেলাকে নিয়ে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০০০-এ ভারত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (MDG)'-এ স্বাক্ষর করে। ২০০২-তে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (NHP)' এবং দশম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০৭ এর মধ্যে দেশে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণের (১০ হাজার জনসংখ্যায় এক জনের কম রোগী) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরে অবশ্য তা ২০১১ ও ২০১৫-তে দু-বার বর্ধিত হয়। ২০০৩-এ কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি 'ন্যাশনাল ভেক্টর বোরন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (NVBDCP) ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। GFATM অর্থ সাহায্য করে। ২০০৫-এ NVBDCP 'ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (NRHM)' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেই। বালুরঘাট শহরের জেলা লাইব্রেরির একতলার একটি অংশে তখন জনস্বাস্থ্য বিভাগ। একদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া অফিসার রাজ্যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার একটি দলিলে কালাজ্বর নির্মূলের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কালাজ্বরের Nil রিপোর্ট দেখে একজন প্রবীণ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আমায় বললেন, "আপনাকে অনেক কালাজ্বরের কেস দেখাতে পারি"।

পরদিন সকালেই তাঁকে আমাদের জিপে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে আমরা গেলাম বালুরঘাট ব্লকের খাঁপুর গ্রামে। এই সেই ঐতিহাসিক গ্রাম যেখান থেকে অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলার তেভাগা কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে হত কৌশল্যা কামারিনি, হোপাই মারডি, চিয়ার শাই শেখ প্রমুখ ২১ জন শহিদ কৃষক যোদ্ধার অবহেলিত শহিদ বেদী চোখে পড়ল। সেখানে প্রণাম জানিয়ে প্রথমে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসকের সাথে কথা বলে একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ওই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের সম্ভাব্য বাড়িগুলিতে গেলাম। আমাদের হাতে ততদিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র চলে এসেছে – rK 39 Rapid Diagnostic Kit।

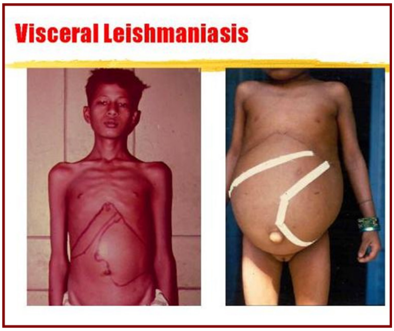

অ্যালডিহাইড টেস্টের মত দীর্ঘসুত্রী ও অত্যধিক ফলস পজিটিভ রেজাল্ট সম্পন্ন কিংবা Splenic বা Bone Marrow Aspiration এর মত চরম বেদনাদায়ক নির্ণয় পদ্ধতির বিপরীতে এটি আঙ্গুলে সামান্য খোঁচা দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা। সন্ধ্যেয় ফেরার আগে ক্লিনিকালি পজিটিভ কেসগুলির মধ্যে থেকে পাঁচটি কেস কে rK 39 দিয়ে কনফার্মড করা গেল। এরপর বালুরঘাট বিমানবন্দরের পাশে একটি চার্চের ফেইথ হিলিং সেশানে আদিবাসী সমাবেশে বেশ কয়েকটি কালাজ্বরের কেস পেলাম। মিশনারি অফ চ্যারিটি হাসপাতালের সিস্টার কমলা, যিনি নিজে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা একজন MD গাইনোকলজিস্ট, অনেকগুলি রোগীর সন্ধান দিলেন। অন্যান্য অঞ্চল থেকে, বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে প্রচুর কেস নির্ণয় হচ্ছিল। প্রথম PKDL রোগীর সন্ধান পেলাম গঙ্গারামপুর ব্লকের একটি গ্রামে। জেলা হাসপাতালের একমাত্র ডারমাটলজিস্ট ডাঃ ব্যানার্জী খুবই সাহায্য করলেন। রোগীকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে উনি Sponge Biopsy করে Skin smear এর স্যাম্পেল দিলেন। জেলায় কোন ব্যাবস্থা নেই, সেটি মালদার একটি নামী প্রাইভেট ল্যাব-এ পাঠানোর পর তাতে LD Bodies পাওয়া গেল।

এরমধ্যে খাসপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বিতীয় মেডিকেল অফিসার ডাঃ শেঠ

একটি কাণ্ড করে বসলেন। একদিন রাতে ফোনে জানালেন যে একটি আড়াই মাস ধরে জ্বরে ভোগা পাঁচ বছরের ওঁরাও মেয়েকে ওর ঠাকুমা ভর্তি করেছেন। এর আগে মেয়েটি জেলা হাসপাতালে ও একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিল।

অনেক পরীক্ষা করেও কোন Diagnosis করা যায়নি, PUO (Pyrexia of Unknown Origin অর্থাৎ অজানা জ্বর) লিখে রেফার করা হয়েছিল। অনেকরকম Antibiotics দিয়েও জ্বর কমানো যায়নি। খুব দুর্বল, Severe Anaemia এবং Hepato-splenomegaly রয়েছে। ডাঃ শেঠ rK 39 দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। পরেরদিন rK 39 এবং কালাজ্বরের ওষুধ Inj. SSG (Sodium Stibogluconate) নিয়ে হাজির হলাম। ক্লিনিকালি দেখার পর rK 39 পজিটিভ হল। আমরা নজরদারি রেখে Inj. SSG চালু করব স্থির করলাম। ওখান থেকে খুঁজে খুঁজে তপন ব্লকের হাসাইপুর গ্রামের জনজাতি ওঁরাও পাড়ায় গেলাম। গরীব ভুমিহীন পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নারী পুরুষ বেশিরভাগই ভিনরাজ্যে কাজে। বৃদ্ধ ও শিশুরা রয়েছেন। জানলাম এখানে অনেকদিন ধরে কালাজ্বর রয়েছে, অনেকে মারাও গেছেন। দু'দিন পর খবর এল মেয়েটির জ্বর কমতে শুরু করেছে। ওষুধের কোর্স সম্পূর্ণ করে মেয়েটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরায় আমাদের আনন্দের শেষ নেই। বিষয়টি STM তাদের জার্নালে প্রকাশ করল। জেলায় এত এত কালাজ্বর নির্ণয় হওয়ায় স্বাস্থ্য ভবনে হৈ চৈ পড়ে গেল। প্রতিবেদককে তলব করা হল।

খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার চেম্বারে বিচার শুরু হল। পতঙ্গ বাহিত রোগের রাজ্য নোডাল অফিসারও ছিলেন। দু'জনেই প্রতিবেদককে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। যক্ষ্মা কর্মসূচিতে থাকার সময় তাঁদের জেলার আনাচে কানাচে নিয়ে গিয়ে, প্রচুর সমস্যা তুলে ধরে খুব কষ্ট দিয়েছিলাম। প্রথমে একটু রাগারাগি করলেও বেশি কিছু বললেন না। বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন এত এত কেস দেখাচ্ছ কেন্দ্রকে কি জবাব দেব? একজন সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে

নির্দেশ দিলেন জেলায় গিয়ে সরেজমিনে দেখতে। তিনি এসে জেলা ঘুরে আমাদের সমর্থন করলেন। আর আমরাও নতুন নতুন রোগীকে নির্ণয় করে তাদের চিকিৎসা করে যেতে লাগলাম। আমাদের দেখাদেখি মালদা প্রভৃতি জেলা কেস রিপোর্ট করতে শুরু করল। সরকার বাহাদুর দেখলাম নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা সীমান্ত গ্রামগুলিতে বাংলাদেশের সাথে সমন্বয় করে কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কারণ ওদিকেও প্রচুর কেস। ওই সময় আমাদের হাতে আরেকটি অস্ত্র এল। Tab. Miltefosine কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হল। Inj. SSG নিতে রোগীদের খুব যন্ত্রণা হত। তাই অনেকে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতেন না। PKDL এর ক্ষেত্রে টানা ৯০ দিন ইঞ্জেকশন নিতে হত। এমনও হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা ঝুলছে। ইঞ্জেকশনের ভয়ে রোগী সপরিবারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন।

পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসে ক্যানিং ১ ও বাসন্তী ব্লকে বিশেষ কালাজ্বর নির্মূলকরণ অভিযানে অংশ নিয়েছি। তখন দেখেছি প্রাদুর্ভাবযুক্ত ব্লক স্তরে Kala-azar Treatment Supervisor (KTS) পদের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসায় Inj. Amphotericin B যুক্ত হয়েছে। অনেক পরে কয়েক বছর আগে স্নাতকোত্তর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিদর্শনে গিয়ে মালদায় তখনও বেশ কিছু কেস দেখলাম। Kala-azar – TB – HIV Co-existent কেসও ছিল, যাদের মৃত্যু হয়। ওষুধের অনিয়মিত সরবরাহ সেখানে একটি গুরুতর সমস্যা।

কালাজ্বরের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণঃ বর্তমানে নিম্নোক্ত চারটি কম্বিনেশনের প্রথম দুটির যে কোন একটি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

১) Inj. Amphotericin B – এক মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায় ৫% ডেক্সট্রোজ ইনফিউশনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ধরে। একদিন বাদে একদিন। এরকম ১৪ টি ইঞ্জেকশন।

২) Inj. Liposomal Amphotericin B – ১০মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায় ৫% ডেক্সট্রোজ ইনফিউশনে। একটিমাত্র ইঞ্জেকশন। ব্যয় বহুল।

৩) Inj. Emulsified Amphotericin B – ১৫ থেকে ২০ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায়। একটিমাত্র ইঞ্জেকশন।

৪) Tab. Miltefosine (২.৫ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) + Inj. Paromycin (১১ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) – ১০ দিন।

PKDL এর চিকিৎসা (যে কোন একটি) -

১) Tab. Miltefosine (ওজন অনুযায়ী ৫০ মিলিগ্রামের একটি বা দুটি ট্যাবলেট) – ২৮ দিন।

২) Inj. SSG (২০ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) – শিরায় বা মাংসপেশিতে X ৯০ – ১২০ দিন।

৩) Inj. Amphotericin B – তিন থেকে চারটি কোর্স, তিন থেকে চার মাস ধরে।

৪) Inj. Liposomal Amphotericin B (৫ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) - সপ্তাহে দু'বার করে তিন সপ্তাহ।

Amphotericin B হৃদপিণ্ড, যকৃত ও বৃক্কের রোগে এবং Miltefosine শিশু, গর্ভবতী ও বৃদ্ধদের দেওয়া যায়না।

বাহক বেলে মাছিদের নিয়ন্ত্রণে (Vector Control) পাকা গৃহের ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহ পরিবেশের উন্নতি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মশারি ব্যবহার সহ ব্যক্তিগত প্রতিষেধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। Integrated Vector Management নিয়ে খুব চর্চা চলছে। এছাড়াও বছরে দু'বার Alphacypermethrin 5% wp দিয়ে ঘর ও গোয়ালঘরে দেওয়ালের ছয় ফিট উচ্চতা অবধি Indoor Residual Spraying (IRS) করা হয়।

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীঃ এই বরেণ্য এবং বিস্মৃতপ্রায় দক্ষ চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও বিরাট মাপের গবেষক ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ পরাধীন ভারতের বাংলা প্রদেশের বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সারডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ নীলমণি ব্রহ্মচারী ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিকিৎসক ছিলেন। মাতা ছিলেন সৌরভ সুন্দরী দেবী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র তিনি মুঙ্গের জেলার জামালপুরের রেলের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হুগলি মহসীন কলেজ থেকে গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। এরপর তিনি রসায়ন নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. পাশ

করেন। তারপর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এম.বি. পরীক্ষার ফাইনালে মেডিসিন ও সার্জারি দুটি বিষয়েই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুডিফ ও ম্যাকলিওড মেডেল পান। তারপর এম.ডি. এবং পি.এইচ.ডি. করেন। তাঁর পি.এইচ.ডি. –র গবেষণা পত্র ছিল ‘Studies in Haemolysis’। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ননীবালা দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের তিনটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস ভুক্ত না হয়েও তাঁর মেধা ও দক্ষতার কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, মেডিকেল কলেজ কলকাতা, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমান আর জি কর), ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, আই.সি.এম.আর.-এ চিকিৎসা, অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। মেন্টে এবং উইলিয়াম জোন্স মেডেল পান। ১৫০ টি গবেষণা পত্র লিখেছেন যার অনেকগুলি *ল্যানসেট*, *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল* প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। ভয়াল কালাজ্বরের প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে তিনি কালাজ্বরের ওষুধ তৈরির উপর মনোনিবেশ করেন। তারপর নিরলস গবেষণা চালিয়ে সেই সময়কার কালাজ্বরের যুগান্তকারী ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেন যা ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। কালাজ্বর নিরাময় অসম্ভব রোগ থেকে নিরাময় সম্ভব রোগে পরিণত হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রিত দুনিয়া তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯২৯ ও ১৯৪২-এ দু দু’বার তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্যে প্রস্তাবিত হয়েও বাতিল হয়ে যায়। পরে কায়সার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডেল, রায় বাহাদুর, নাইটহুড, ফেলো অফ রয়াল সোসাইটি, লন্ডন প্রভৃতি সম্মাননা পান। ১৯৩৬-এ তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯-এ ভারতের প্রথম ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করেন স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে।

এশিয়াটিক সোসাইটি, রেড ক্রশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, চিড়িয়াখানা সহ বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, সেন্ট্রাল সেরামিক ইনস্টিটিউট সহ বহু প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা করেন। দেশ স্বাধীনতা লাভের আগেই এই মহান বিজ্ঞানসাধক, মানবতাবাদী, বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং একনিষ্ঠ গবেষকের মৃত্যু হয়। তাঁকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। কেবলমাত্র পরনির্ভর না হয়ে চিকিৎসা গবেষণার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলি এবং মেডিকেল শিক্ষা ব্যাবস্থাকেও উন্নত করে তুলি যাতে আগামীদিনে প্রথম শ্রেণির গবেষকরা উঠে আসেন।

[লেখক প্রাবন্ধিক]

VISCERAL LEISHMANIASIS OR KALA-AZAR

Rama Prosad Goswami

Visceral leishmaniasis or Kala-azar is endemic in 75 tropical and subtropical countries. India, Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Sudan, and South Sudan together are responsible for more than 90% cases worldwide. Endemic areas in India: Bihar, West Bengal, Jharkhand, eastern UP.

In the Indian subcontinent the disease is caused by *L. donovani* which is transmitted by the sand fly vector *P. argentipes* and humans are the reservoirs. The ratio of latent VL to active VL may be in the range of 4:1 to 50:1 in an endemic region.

The incubation period can vary between 2 and 8 months. The disease may remain latent in most infected persons. However, such persons may develop active VL after many years of latent infection (2–29% within 3 years).

Clinical features: The classic pentad of VL includes:

- Fever
- Progressive weight loss
- Hepatosplenomegaly
- Pancytopenia
- Hypergammaglobulinemia

In endemic areas low-grade symptoms may be present for weeks to months before the patient seeks medical attention. The

spleen can be massively enlarged and it is soft to firm and non-tender (a hard spleen points toward other diagnoses).

Visceral leishmaniasis may also present acutely in non-immune persons (Such as - a British student coming to Baishali district, Bihar for anthropological study) which is characterized by abrupt onset high fever and chills, sometimes with a periodicity mimicking malaria.

Typical laboratory findings include:

- Anaemia (normocytic and normochromic)
- Leukopenia (severe eosinopenia is suggestive)
- Thrombocytopenia
- Hypergammaglobulinemia (can be as high as 9 g/dL)
- High erythrocyte sedimentation rate (ESR)

Diagnosis: The classical pentad in endemic area has high positive predictive value for diagnosis. Parasitological diagnosis is the gold standard.

Splenic aspiration has high sensitivity (93–99%) and can also be used for quantification of parasite burden and monitoring of treatment response. However, it has the risk of life-threatening hemorrhage.

Bone marrow aspiration is a safer alternative but it is less sensitive (60–85%). Liver biopsy is even less sensitive.

Molecular approaches can reach up to 93% sensitivity and 96% specificity. Quantitative PCR assay can assess parasite burden and is also useful for monitoring treatment response.

Immunologic tests include rK39 immuno-chromatography and direct agglutination test (DAT) using blood sample. Both have high specificity (>90%).

The rK39 strip test is very easy to perform, field adaptive and highly sensitive and specific. It can also be performed using urine sample (Goswami RP et al, J Post Grad Med, 2012). K39 strip test is usually done with 1 drop of blood and 2 drops of buffer but test with urine sample is to be done with 2 drops of urine and 1 drop of buffer. Appearance of two red lines is the positive result.

The test may be positive in ~12% of healthy endemic control i.e. normal host. In that case it represents either past history of VL or present asymptomatic subclinical infection. Another aspect of the test is that it remains positive long after clinical cure - ~100% up to 5 years, ~50% upto 10 years and rarely more than 20 years. So it can not be used in relapse cases where tissue aspiration or PCR is to be done.

The diagnostic criteria in remote peripheral area –

(1) Patient coming from endemic area with clinical features of VL

(2) K39 strip test positivity

(3) No past history of VL

KAtex (latex agglutination test) using urine sample is a promising test. It is cartridge based test. A meta-analysis in 2018 found that KAtex had good specificity (97%) but suffered from poor sensitivity (77%). But the positive aspect of the test is that it becomes negative after clinical cure. So it may be adopted as test of cure.

K39 is the test of diagnosis and KAtex is the test of cure.

Immunocompromised hosts - VL with HIV :

Immunocompromised patients with *Leishmania* infection have higher risk of progressing to clinical VL (4-fold in transplant patients and 100–2,300-fold in HIV patients). The impaired cell-mediated immunity causes higher parasite burden. VL co-infection also causes progression of HIV infection.

Atypical presentations are much more common in patients with CD4 count <50 cells/mm^3 and include:

- Atypical skin lesions
- Gastro-intestinal tract involvement (chronic diarrhoea, malabsorption, etc.)
- Airway, pleural, or pericardial involvement
- Eye involvement like anterior uveitis

Parasitological diagnosis is easier with many tissue samples like skin, buccal mucus membrane or rectal scrapings. PCR remains highly sensitive but serology may be less sensitive in these patients.

Treatment: The recent treatment options for VL –

1. Liposomal amphotericin B(LAmB)
2. Miltefosine
3. Paromomycin

Drug	**Dose**		**Duration**
Liposomal amphotericin B	10 mg/kg		Single dose infusion
Miltefosine	2–11 years	2.5 mg/kg/day	28 days
	>12 years and <25 kg body weight	50 mg/day	
	25–50 kg body weight	100 mg/day	
	>50 kg body weight	150 mg/day	

***Liposomal amphotericin B*:** The preferred treatment for VL is liposomal amphotericin B which can be used in all age groups and even in pregnancy. The drug acts like "Magic Bullet ". This is a targeted delivery, the drug being concentrated in macrophage

monocyte system where LD bodies are also concentrated. As it does not invade other visceral cells, it is generally less toxic to kidney. Adverse reactions may include fever, rigor, nausea, vomiting, hypokalaemia and hypomagnesemia. The use of single dose LAmB (10mg/kg) has revolutionised the management of VL. Cure rate >90%.

Liposomal amphotericin B, branded *as AmBisome (Gilead Pharmaceuticals, Foster City, CA), is* recommended by World Health Organization (WHO) for management of VL and it is available in India with preferential pricing for developing countries. Authors used a liposomal amphotericin B preparation, developed in India and commercially available as FungisomeTM (Lifecare Innovations Ltd., Gurgaon, Haryana, India), for the treatment of VL. Fungisome requires sonication* for 45 minutes before administration. Like AmBisome, Fungisome is also an intravenous infusion (normal saline in contrast to 5% dextrose for AmBisome). Authors observed a short course 2-day regimen of 15 mg/kg Fungisome yielded 100% cure rate at 6 months after completion of treatment. [*Applying sound energy to agitate particles in a liquid]

***Miltefosine*:** The most beautiful part of miltefosine therapy is that it is the only oral agent available for the treatment of VL. But its half-life is very long – first elimination half-life is 7 days and terminal elimination half-life is 30 days. Miltefosine is eliminated from the body very slowly being still detectable from human plasma 5-6 months after end of therapy. The presence of subtherapeutic miltefosine concentration in blood beyond months after treatment contributes to selection of resistant parasite. So it should be used as single agent.

Adverse reactions of miltefosine include nausea, vomiting, dizziness, scrotal pain, nephrotoxicity, and hepatotoxicity.

Miltefosine is teratogenic and is contraindicated in pregnancy. Recently eye toxicities and blindness have been reported.

***Paromomycin*:** Paromomycin (11mg/kg IM for 10 days) is used in combination with Miltefosine in India. The adverse effects of Paromomycin include injection site pain, raised aspartate aminotransferase, reversible ototoxicity, and nephrotoxicity.

Two older agents used in VL:

1) *Amphotericin B deoxycholate* (0.75 - 1 mg / kg / day infusion daily or on alternate days x15-20 doses): Amphotericin B deoxycholate generally has poorer tolerability and higher toxicities than liposomal amphotericin B. However, it is being used as rescue therapy when other agents fail or cannot be used.

2) Pentavalent antimonials (SSG or Stibanate) (20mg/kg/day x 30): It is not being used now a days as >80% cases are resistant in India. SSG with Paromomycin is the WHO recommended first line therapy for uncomplicated VL in East Africa. Side effects are common – nausea, vomiting, pain abdomen, myalgia, arthralgia, hepatotoxicity and cardiotoxicity. SSG should not be given in pregnancy as ~ 60% spontaneous abortion has been reported.

Combination therapies: Future therapy would be combination therapy.

Advantages:

- Increased efficacy
- Decreased toxicities
- Decreased resistance
- Shorter duration
- Higher compliance
- Lesser chance of relapse and development of PKDL

Combination therapies in India (Sundar S *et al*, The Lancet.2011):

- Miltefosine + Paromomycin (11mg/kg IM) for 10 days
- LAmB 5 mg/kg SD followed by Miltefosine for 7 days
- LAmB 5 mg/kg SD followed by Paromomycin for 10 days. Cure rate > 97%.

In another Indian study on combination therapy for VL (Goswami RP *et al.* Am J Trop Med Hyg. 2020), single dose 7.5 mg/kg Fungisome followed by Miltefosine (2.5 mg/kg/day for 14 days) achieved 100% cure rate. There was no relapse and no incidence of PKDL over a follow-up period of 5 years.

Treatment of HIV and VL co-infection: VL co-infection is a criterion for stage 4 HIV disease. Co-infection is characterised by increased treatment failure, high relapse rate and high mortality. In a study conducted in Eastern India (Goswami *et al*, Am J Trop Med Hyg. 2017), the secondary prophylaxis with liposomal or conventional amphotericin B deoxycholate (1 mg/kg monthly) till CD4 count >200/micro liter significantly reduced relapse as well as mortality (100% in 6 months follow-up).

In 2021 WHO formed a Guideline Development Group for management of HIV-VL co-infection. The author was one of the members of the group.

WHO recommendations for treating HIV-VL co-infection in South-East Asia- 2021

- Liposomal Amphotericin B (Total 30 mg/kg at 5 mg/kg on days 1, 3, 5, 7, 9 and 11) + Miltefosine (100 mg/day for 14 days)
- Secondary prophylaxis should be given after the first episode of visceral leishmaniasis
- Routinely screen for TB at visceral leishmaniasis diagnosis and further follow-up

POST-KALA-AZAR DERMAL LEISHMANIASIS

Post-kala-azar dermal leishmaniasis manifests as macular, papular, nodular, verrucous or erythematous skin lesions after treatment of VL in 10 - 20% cases within months to 3 years. It does not ulcerate, does not itch and does not involve palms and soles usually.

The likely factors associated with this response are suboptimal therapy, host genetic predisposition, parasite strain difference, ultraviolet light exposure etc. PKDL might be drug related phenomenon – it is rarely seen after full course of AmB but commonly seen after Stibanate and Miltefosine.

The diagnosis can be done clinically. However, it is also possible to demonstrate amastigotes in the slit skin smear or by PCR.

PKDL patients are infectious to sand flies and hence may act as a reservoir of *Leishmania* in a community. Effective treatment of PKDL patients may be helpful in eliminating VL.

Treatment: The treatment of PKDL typically requires longer duration and outcome is frequently unsatisfactory.

	Treatment regimen for PKDL in India.	
Drug	Dose	Duration
Miltefosine	Daily dose same as VL	12 weeks
Amphotericin B deoxycholate	1 mg/kg/day infusion	60−80 doses over 4 months
Liposomal amphotericin B	5 mg/kg twice weekly	3 weeks

The first two regimens are impractical, toxic and compliance is very low. The future treatment should be combination therapy. Many studies are published in international literature on combination particularly with LAmB and Miltefosine (15-20 mg/kg LAmB in 3-5doses with Miltefosine for 3-6 weeks).

Prevention

An infectious disease is interaction of agent, host and environment. The agent (LD) is identified and effective chemotherapy and newer techniques for drug delivery have been developed. Newer insecticides have been used to combat sandfly resistance. But are these enough?

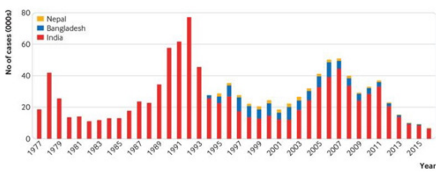

Though the cases have been dramatically declined over past few years, Kala-azar does not seem to be eliminated in India. It is still occurring in sporadic areas over more than expected rate (>1/1000 population) emerging in new area and re-emerging in old area. Scientific research is not enough for elimination of an infectious disease in a developing country. Kala-azar is the disease of the poorest of poor. It is the political commitment of

our leaders and administrators to look at the poor living condition of agricultural labourers in remote villages, who are the great productive forces and prime victim of this deadly disease. They live in a poorly thatched mud house, with cracks and crevices in walls, co-habiting with domestic animals. This is ideal situation for sand fly breeding. So an improved basic health system (social commitment of leaders and health workers) and environment (pucca house with cemented walls with seperate animal house) are basic necessities.

It is worth mentioning that recently Bangladesh is declared to have achieved Kala-azar elimination by WHO and the author was one of the members of Independent Validation Team (IVT) of WHO. Bangladesh has taught the lesson that social commitment with improved grassroot level basic health system can achieve the target of Kala-azar elimination.

Elimination of human reservoir:

- Improved basic health system
- Improved testing and treatment of VL cases
- Effective treatment of PKDL patients

Vector control:

- Insect repellents (e.g., N N-diethyl-meta-toluamide)
- Insecticides (e.g., Permethrin)
- Insecticide treated bed nets
- Indoor residual spray (e.g., Dichlor-diethyl-trichlorethane)

Before concluding, I like to make some comments on the natural history of this disease.

- The downward trend may be the result of the "natural" fluctuation of the disease. Communities that had some herd immunity in the past may gradually becoming fully susceptible.
- The rising trend in Post Kala-azar Dermal Leishmaniasis together with the emergence of coinfection with HIV is concerning
- Patients with these conditions may serve as reservoirs of infection, perpetuating transmission even when the elimination targets are reached. Treatments for both conditions are far from ideal till now.

In India, VL is stated to be purely anthroponotic. Is it fact or myth? There is no sincere scientific effort or evidence published in international literature to establish this presumption.

Future studies should be aimed at:

1) **Asymtomatic human carrier?**

Observations from an Indian study (V N Rabi Das *et al*, PLoSNegl Trop Dis 2020) suggested the probability:

- 5794 healthy individuals from VL endemic region
- 308 Rk39 positive
- 42 RT-PCR confirmed asymptomatic VL.
- They were followed up through repeated qPCR.
- 10 out of 42 converted to symptomatic cases over years

2) **Asymtomatic animal reservoir?**

One study from Indian subcontinent (Bhattarai N R *et al*. Emerg Infect Dis, 2010) showed PCR positivity among healthy persons (6.1%) and animals (cows 5%, goats 16%) in an area of active VL transmission in Nepal.

No form of chemoprophylaxis is available for preventing leishmaniasis. Till now, no vaccine is available for human. However, several vaccines are in development. An effective vaccine for susceptible population may be the answer in future.

[Dr. Rama Prosad Goswami, Professor, Formerly at Department of Tropical Medicine, School of Tropical Medicine, Kolkata]

WHO on Leishmania-HIV Co-infection

People living with HIV and who are infected with leishmaniasis have high chances of full blown disease, high relapse and high mortality rates. Antiretroviral treatment reduces the development of the disease, delays relapses and increases the survival. As of 2021, Leishmania—HIV Co-infection has been reported from 45 countries. High Co-infection rates are reported from Brazil, Ethiopia and the state of Bihar, India.

ডেঙ্গুর ভাই চিকুনগুনিয়া

অরণি সেন

চিকুনগুনিয়াকে কেন ডেঙ্গুর ভাই বলছি? কারণ চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) ডেঙ্গুর মতই একটি আরবো ভাইরাস ঘটিত রোগ (Arboviral Disease); প্রাথমিক লক্ষণগুলিও একরকম এবং একই প্রজাতির এডিশ মশার কামড়ে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া হয়। তবে চিকুনগুনিয়া গুরুতর হলেও ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের মত মারণঘাতী নয়।

চিকুনগুনিয়া রোগের ভাইরাসটির নাম চিকুনগুনিয়া ভাইরাস (CHIKV) যেটি আলফা ভাইরাস গোত্রের এবং টোগাভাইরাস পরিবারের। সংক্রামিত স্ত্রী এডিশ ইজিপটি অথবা অ্যালবোপিকটাস মশার কামড়ে চিকুনগুনিয়া রোগ হয়। প্রবল জ্বর এবং গাঁটে গাঁটে বা সন্ধিতে সন্ধিতে এবং মেরুদণ্ডে প্রবল ব্যথা (Excruciating Articular Pain) এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৫২ সালে তাঙ্গানিকায় (তানজানিয়া) প্রথম চিকুনগুনিয়া ভাইরাসকে পৃথক করা যায়। ১৯৬০এর দশক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কোন কোন জায়গায় মহামারী দেখা যায়। এটিও একটি ক্রান্তীয় অঞ্চলের (Tropical) পতঙ্গবাহিত রোগ। ২০০৬ থেকে এই রোগের পুনরাবির্ভাব (Re-emergence) ও বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। ভারতে ও অন্যত্র বেশ কিছু স্থানীয়স্তরের মহামারী (Outbreak) দেখা যায়।

এডিশ মশা

চিকুনগুনিয়া শব্দটির উৎপত্তি পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি জনজাতিদের বান্টু-সোয়াহিলি শব্দভাণ্ডার থেকে। এর অর্থ যন্ত্রণায় বেঁকে যাওয়া (Doubling Up)। এই জ্বরে দেহের গ্রন্থিগুলিতে প্রবল যন্ত্রণা হয় যা কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর অবধি থেকে যেতে পারে। এডিশ মশা দিনে কামড়ায়। মানুষের দেহে জীবাণুর যৌন চক্র এবং মশার দেহে অযৌন চক্র সংঘটিত হয়। অল্প জলে ঘরের আনাচে কানাচে এডিশ মশা ডিম পাড়ে। জলের সংস্পর্শে ডিম থেকে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা, পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা হয়। এর জন্য

সাত দিনের মত লাগে। সংক্রামিত মানুষই হল এই রোগের উৎস (Source) এবং আধার (Reservoir)। মশার দেহে ৮-১০ দিনের মধ্যে বাহ্যিক জীবন চক্রের (Extrinsic Life Cycle) মাধ্যমে ভাইরাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সংক্রামিত মশার কামড়ের ২ থেকে ১২ দিনের মধ্যে (Incubation Period) মানুষের দেহে চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ ও লক্ষণগুলি দেখা যায়। আকস্মিক প্রবল জ্বর। ৪-৭ দিন থাকে। এর সাথে শীতভাব; মাথা, চোখের পিছনে, পিঠ এবং সারা দেহের পেশী ও গ্রন্থিগুলিতে ব্যথা; কারো কারো চোখে কনজাংটিভাইটিস এবং লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ। ৬০-৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে চামড়ায় লালচে রঙের ছোট ছোট গোলাকৃতি ফুসকুড়ি (Morbiliform or Maculopapular rashes) দেখা যায় যা ৩-৭ দিন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চুলকায় (Prurities)। অনেকের ক্ষেত্রে ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণের জন্য দেহাকাণ্ড এবং হাত ও পায়ের চামড়ায় লালচে বিবর্ণ দাগ (Purpura) দেখা যায়।

এছাড়াও কফি রঙের বমি, পেট ব্যথা, নাক দিয়ে রক্তপাত, চামড়ায় লালচে ছোপ (Petechiae) দেখা যায়। শরীরের গ্রন্থিগুলির, বিশেষ করে হাঁটু, গোড়ালি, কোমর, মেরুদণ্ড, কব্জি, কনুই ও আঙ্গুলগুলির (Metacarpophalangeal and metatarsal joints) প্রদাহ (Inflammation), যন্ত্রণা (Arthropathy), স্ফীতি (Swelling) ও শক্ত হওয়ার (Stiffness) ঘটনা ঘটে। গ্রন্থিগুলির তীব্র যন্ত্রণায় রোগীরা খুব কষ্ট পান। আবার কোন কোন চিকুনগুনিয়া সংক্রমণের ক্ষেত্রে কোন উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে একইসাথে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার সংক্রমণ (Co-infection) পাওয়া যায়। HLA-B27 লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন সম্পন্ন ব্যক্তিরা চিকুনগুনিয়ায় বেশি ভোগেন। প্রাদুর্ভাবপূর্ণ (Endemic) এলাকায় লোহিতকণিকার সাথে চিকুনগুনিয়ার জীবাণু থেকে যায় (Recrudescence)।

একসময় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়াকে শহর ও শহরতলির রোগ (Urban

and peri-urban disease) বলা হত। এখন মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধির কারণে শহর ও গ্রাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ১৬-২৮° সেলসিয়াস উষ্ণ তাপমাত্রা, ৬০-৮০ শতাংশ আদ্রতা এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিতে এডিশ মশার বংশবৃদ্ধি হয়। এডিশের ডিমগুলি প্রবল শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যেও এক বছরের বেশি টিকে থাকে (Dessication)। সামান্য জল পেলেই একদিনের মধ্যে লার্ভায় পরিণত হয়। একেকটি স্ত্রী এডিশ মশা তার জীবিতকাল দুই থেকে তিন সপ্তাহে অন্তত তিনবার একেকবারে গড়ে ১০০টি করে ডিম পাড়ে।

এনজাইম লিনকড্ ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে (ELISA), আর টি—পি সি আর, ভাইরাস আইসোলেশন প্রভৃতি পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। কোন কোন জায়গায় MV-CHIK টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে। জ্বর ও ব্যথার জন্য সঠিক মাত্রায় প্যারিসিটামল ব্যবহার করা হয়। বিশ্রাম, বেশি করে জল পানের সঙ্গে গৃহ চিকিৎসককে অথবা হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখিয়ে চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়। চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে রক্তের শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিকা কমে যেতে পারে, কিন্তু হিমাটোক্রিট ঠিক থাকে।

প্রতিবিধানের উপর জোর দেওয়া হয়। এর প্রধান দিক বাহক মশার নিয়ন্ত্রণ (Vector Control)। গর্ত ইত্যাদি বুজিয়ে ফেলা (Land Filling and Source Reduction); সঠিক পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ (Proper Water Storage Practice) ও সাতদিনে একবার জমানো জল পাল্টানো; লার্ভাঘাতী স্প্রে ব্যবহার (Targeted residual spraying and space spraying/fogging); জলাশয়ে লার্ভাভুক গাপ্পি, গাম্বুসিয়া মাছ ছাড়া; সঠিক নিষ্কাশন (Drainage) ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা। সঠিকভাবে বর্জ্য সংস্থাপন (Waste Management) প্রভৃতির মাধ্যমে মশার বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাগ্রহণ (Individual Protection) অর্থাৎ বসবাসের গৃহের উন্নতি ঘটানো, জানালায় নেট লাগানো, ঢাকা পোশাক ও জুতো-মোজা পরা এবং ঘুমোনোর সময় মশারি ব্যবহার করা (Inseticide-treated Bed Nets)। যদিও এডিশ মশা সাধারণত দিনে কামরায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাহক মশার উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। সেই লক্ষ্যে রোগীর গৃহের অথবা মহামারী এলাকার থেকে অন্তত ৪০০ মিটার দূরত্ব অবধি বাহক পতঙ্গের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। পতঙ্গ সমীক্ষার (Vector Surveillance) কয়েকটি সূচক :

- হাউজ ইনডেক্স (HI): $\frac{\text{যে গৃহগুলিতে এডিশ মশা পাওয়া গেছে}}{\text{সবশুদ্ধ যে কটি গৃহে সমীক্ষা করা হয়েছে}} \times ১০০$

- কনটেইনার ইনডেক্স (CI): $\frac{\text{যে কটি জল রাখা বা জমা পাত্র বা জায়গায় এডিশ মশার লার্ভা পাওয়া যায়}}{\text{যে কটি পাত্র ও স্থান সমীক্ষা করা হয়েছে}} \times ১০০$

- Breteau Index (BI): $\frac{\text{যে কটি পাত্রে ও স্থানে লার্ভা পাওয়া গেছে}}{\text{যে কটি গৃহে সমীক্ষা করা গেছে}} \times ১০০$

- Man Per Hour Density (MPHD): $\frac{\text{যে কটি স্ত্রী এডিশ মশা ধরা গেছে}}{\text{যত মিনিট মশা ধরার কাজে ব্যয় হয়েছে} \times \text{যতজন কর্মী নিয়োজিত ছিলেন}}$

যে অঞ্চলে আগে চিকুনগুনিয়া রোগী পাওয়া যায়নি সেখানে এক বা একাধিক রোগীর রক্তপরীক্ষায় চিকুনগুনিয়ার জীবাণু পাওয়া গেলে তাকে মহামারী (Outbreak) বলা হয়।

২০০২ সালে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর যে 'জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NVBDCP)' গ্রহণ করে তাতে ১) ম্যালেরিয়া, ২) ডেঙ্গু, ৩) জাপানি এনকেফেলাইটিস, ৪) কালাজ্বর ও ৫) লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিস এর সাথে ৬) চিকুনগুনিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৫ সালে এই জাতীয় কর্মসূচিটি জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের (NRHM) সাথে সংপৃক্ত হয়। ২০১৯ এ দেশের ২১ রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৮১,৯১৪ জন চিকুনগুনিয়া রোগী সনাক্ত করা গেছে যায় মধ্যে ১২,২০৫টি (১৪.৯%) রক্তপরীক্ষায় প্রমাণিত। ২০২৩এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ একটি টিকা বের করেছে (IXCHIQ) যা ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্যান্য সমগোত্রীয় গুরুত্বপূর্ণ আরবো ভাইরাস পতঙ্গ বাহিত রোগগুলি:

রোগের নাম	বাহক	জীবাণু
১. জাপানি এনকেফেলাইটিস	কিউলেক্স মশা	গ্রুপ বি আরবোভাইরাস (ফ্ল্যাভি ভাইরাস)
২. কায়শানুর ফরেস্ট ডিজিজ (কে এফ ডি)	এক ধরনের টিক	ফ্ল্যাভি ভাইরাস (টোগা ভাইরাস)
৩. ওয়েস্ট নাইল ফিভার	কিউলেক্স মশা	গ্রুপ বি আরবো ভাইরাস
৪. স্যাণ্ড ফ্লাই ফিভার	স্যাণ্ড ফ্লাই	আরবো ভাইরাস

Lymphatic Filariasis : Toward Elimination

Snigdha Banerjee

Introduction & Epidemiology : Lymphatic system is the network of lymph nodes and lymph vessels that maintains the fluid balance between the tissues and the blood which is an essential element of the body's immune defense system. Filaria worms are living in the vessels of the lymphatic system and creating damages.

Culex Mosquito

W. bancrofti, B. malayi and B. timari are round, coiled and threadlike parasitic namatode worms belong to the family filaridae. In India 99.4% infections are caused by W. bancrofti and 90% W. bancrofti infection results to Lymphatic Filariasis from subclinical stages to Elephantiasis. 20 million people are suffering from the disease globally.

It is a disease of the tropic and sub tropics ranging from Asia to Africa to Latin America and Pacific Region where heat and himidity alongwith heavy rainfall prevail vis a vis endemicity of the disease.

The disease is transmitted through bites of infected female Culex, Mansonia and Anopholes mosquitoes where adult worms are living in human lymphatic vessels and microfilariae are circulated at peripheral blood.

Acute and chronic manifestations are fever, pain, lymphangitis, adeno lymphadenitis, funiculitis (inflammation of the spermatic cords), epididymitis (inflammation of the testes);

swelling of the legs, arms, genitals (scrotum, vulva, breast); pitting or non-pitting oedema, hydrocele, chyluria (a rare condition when lymphatic fluid leaks into the kidneys and turns the urine millky white) and elephantiasis causing considerable suffering, deformity and disability as well as social stigma.

Scrotal pain is common and microfilariae may be found in hydrocele, chyluria and blood. Hypersensitivy state may cause Tropical Pulmonary Eosinophilia and Atypical Filarial Arthritis.

Lymphatic Filariasis is a public health problem. Reducing prevalence of microfilariae in human to <1% may stop the transmission. Therefore to ruduce the transmission Govt. of India (GOI) introduced Mass Drug Administration (MDA) in endemic states, UTs and districts since 2004 with an annual single dose of DEC and Albendazole.

Agent Factors :

Human Filarial Infection

Organism	Vector	Disease
1. Wucheraria bancrofti	Culex Mosquitoes	Lymphatic Filariasis
2. Brugia malayi	Mansonia Mosquitoes	Lymphatic Filariasis
3. Brugia timori	Anopheles Mosquitoes, Mansonia Mosquitoes	Lymphatic Filariasis
4. Onchocerca Valvutees	Simulum Flies	Subcutaneous Nodules, River Blindness
5. Loa Loa	Chrysops Flies	Recurrent transient subcutaneous swellings

6. Mansonella Perstans	Culicoides	Probably very rarely any clinical illness
7. Mansonella Streptocerca	Culicoides	
8. Mansonella ozzardi	Culicoides	

Characteristic nocturnal periodicity :

The Worms become active at night and microfilariae appear in large number in the blood stream at night and retreat during the day time. Maximum density of Mf in blood from 10 pm to 02 am (upto 04 am as per Prof. K. D. Chatterjee). Interestingly the biting habits of the vector mosquitoes are biologically adapted at night.

Life Cycle of the agents :

Man is the definitive and mosquito is the intermediate hosts, i.e., sexual cycle occurs in man and asexual cycle occurs in mosquito.

a) Human Cycle : Infected larvae come through mosquito bites and they grow to adult male and female worms. W. bancrofti adult male and female worms are 40 mm and 50-100 mm long respectively. Female worms are viviparous (which produces live offspring rather than eggs) giving birth about 50,000 Mfs per day which find their way into blood circulation via lymphatics. Lifespan af Mfs one year and more. Adult worms survive for 15 years and more. In a case adult worm survived 40 years.

b) Mosquito Cycle : Mfs are picked up during feeding. (i) Exsheathing happens inside the stomach of mosquito when larvae come out from sheaths within 1-2 hours. (ii) First stage of larva : They penetrate the stomach wall and come to thoracic muscle within 6-12 hours. (iii) Second stage of larva : Larvae moult and mature and (iv) Third stage of larva : After the final moult they

become infective. Mosquito Cycle is also called Extrinsic Inculation Period and it lasts 10-14 days.

Host Factors : Mf infestation is found higher in males and it is related with migration, urbanization, poverty, illiteracy, poor sanitation etc. After many years of exposure some people may develop a kind of resistance.

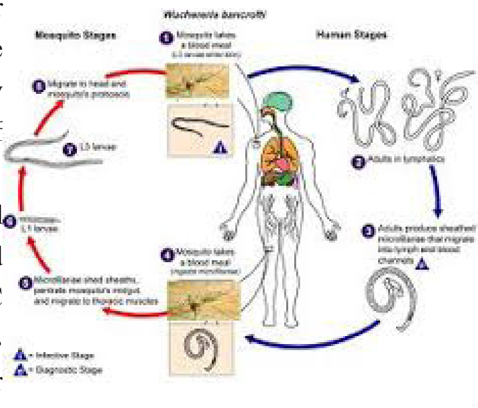

Environmental Factors : Hot humid climate with 22^0C-38^0C temperature and 70% humidity is optimal for living of the Culex mosquitoes. Intermittent rain and water logging; stagnant polluted water, poor drainage system; unplanned habitats with unattended water storage and ill maintained cesspools, open ditches, soak pits, septic tanks, burrow pits, water bodies are favourable for breeding of mosquitoes.

Vectors:

i. Culex quinquefasciatus	Lays 40-150 eggs at a time which can sustain and is hatched within 24-48 hrs. in contact with water. 4 stages of larvae and pupa stage take 10-14 days to reach adult-hood.
ii. Mansonia annulifers	Breeds in aquatic plant Pistia stratiates
iii. Mansonia uniformis	
iv. Anopheles	

Mode of transmission : Bite of infected female mosquito.

Incubation Period : The time interval between inoculation of infective larvae and the first appearance of detectable Mf is known as 'Prepatent Period'

The time interval from invasion of infected larvae to the development of clinical manifestations is known as 'Clinical Incubation Period' which is 8 to 16 months or more.

Clinical Manifestations : Small portions of cases exhibit clinical manifestations whereas most of the cases show Inapparent Infection and act as Carrier. Those cases which exhibit clinical manifestations exhibit in two ways, mostly (1) Lymphatic Filariasis and (2) Occult Filariasis in limited cases.

Elephantiasis

(1) Lymphatic Filariasis :

a) Stage of asymptomatic amicrofilaraemia–

b) Stage of asymptomatic microfilaraemia–These carriers are usually detected by night blood sample examination.

c) Stage of acute manifestation–

Recurrent episodes of acute inflammation, lymphangiectasia and lymphatic dysfunction in lymph glands and vessels due to mechanical irritation; liberation of metabolites and toxic fluid by larvae and fertitized female worms, absorption of toxic products from dead worms and bacterial infections.

Filarial fever, pain, urticaria, fugitive swelling, lymphangitis, lymphadenitis, lymphadenoma of various parts of the body and epididymo-orchitis are comman signs and symptoms.

Those who have circulating microfilariae but outwardly healthy may transmit infection to others through mosquitoes.

d) Stage of chronic obstructive lesions–

Usually 10-15 years after the onset of the disease. Mechanical blocking of lumens by dead worms, endothelial proliferation and inflammatory thickening of afferent lymph nodes lead to chronic filarisis, obstruction of lymph vessels and varicosity of lymph nodes causing permanent structural changes and hypertrophy of affected parts, viz., Hydrocele, Chyluria and Elephantiasis.

The persons with chronic filarial swellings suffer severely from the disease but no longer transmit the disease.

2) Occult Filariasis :

It results from a hypersensitivity reaction to filarial antigens derived from Mfs., e.g., Tropical Pulmonary Eosinophilia exhibiting low grade fever, loss of weight, paroxysmal cough, dyspnoea and splenomegaly turns to Interstitial Fibrosis and Chronic Restrictive Lung Disease. Mfs may be found in lungs, liver and spleen.

Diagnosis : i) Preparation of thick film and microscopy to find Mf.

Filaria Survey : Night mass blood collection from endemic areas.

Management :

a) Lymphadenoma Management :

Early detection, care of the skin, washing and drying of the affected area or limb, elevation of limbs, exercise, wearing proper foatwears etc. and to follow WHO guidelines.

b) Chemotherapy

i) Diethylcarbamazine or DEC : 2mg/kg BW thrice daily x 21 days. Sometimes toxic reactions which usually subside. Pregnant women and children under two years are exempted.

ii) Albendazole : 400 mg, single dose.

iii) Ivermectin : 150-200 mg/Kg BW

c) Drainage of hydrocele, plastic and reconstruction surgery etc.

Control Measures :

a) Vector Control :

i) Anti larval measures : Using Mosquito larvicidal Oil (MLO) like Pyrethrum, Temophos, Fenthion etc.; Deweeding; Desilting; Pisciculture of larvivarous fishes like guppy and gumbuscia; source reduction; land filling, proper sanitation and drainage; proper water storage practice etc. Better to introduce Integrated Vector Management by multiprong approach.

ii) Anti adult measures : Space spray etc. using DDT, HCH, Dieldrin etc.

iii) Individual protection : Full sleeve dresses, using mosquito nets, repellants etc.

National Filaria Contral Programme :

- Introduced in 1955.
- In 1978, Operation Component of NFCP was merged with urban malaria scheme. Antilarval mearsures, source reduction, detection of cases, treatment of Mf carriers, morbidity management, IEC etc.
- In 2000, Global Alliance to eliminate LF (GAELF) was formed.
- In 2002 under National Health Policy (NHP) LF was targeted to be eliminated by 2015. Later it was extended upto 2021.

MDA (a single dose of DEC 6 mg/Kg BW and Albendazole 400 mg) was initiated alongwith home based management of lymphadenoma cases and upscaling hydrocele operations at CHC and above.

• In 2002, LF is included in National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) and in 2005 it was integrated with National Rural Health Mission (NRHM).

• In 2017, Transmission Amessment Survey (TAS) was introduced to assess the programme.

• In 2018, Triple drugs IDA (DEC, Albendazole and Ivermectin) was initiated for endemic districts for next five years alongwith 'Morbidity Management & Disability Prevention (MMDP)'

• 1st November is National Filaria Day and November is the Filaria Month.

• During 2018 to 2021, as many as 256, 272, 328 and 333 endermic districts were identified respectively where >1% mf rate were present.

90% LF burden in India is contributed by 12 endemic states– Bihar (17%), Kerala (15.7%), Uttar Pradesh (14.6%), Andhra Pradesh (10%), Tamilnadu (10%), Jharkhand, Odisha, Chhhattisgarh, Madya Pradesh, Maharastra, West Bengal and Assam. They have 86% of Mf cases and 97% disease cases of the country.

• 0.55 million Lymphadenoma and 0.15 million Hydrocele cases were detected in 2022.

• Like all Neglected Tropical Diseases (NTD) Lymphatic Filariasis (LF) is also targeted to be eliminated by 2030 under Sustainable Development Goals (SDG).

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৪ (নব পর্যায়) :
পতঙ্গবাহিত গুরুতর রোগ: কালাজ্বর, চিকুনগুনিয়া ও ফাইলেরিয়া

- কালাজ্বরের বাহক বেলে মাছি নিয়ন্ত্রণে ঘর ও গোয়ালঘর পরিচ্ছন্ন রাখুন, দেওয়ালের ফাটল বুজিয়ে ফেলুন। খাট, তক্তপোষ বা মাচায় ঘুমোন। মশারি ব্যবহার করুন
- কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া গুরুতর অসুখ। সময়মত ও ঠিকমত চিকিৎসা না করলে প্রাণসংশয় কিংবা দৈহিক বিকৃতি ঘটতে পারে
- চিকুনগুনিয়া ও ফাইলেরিয়ার বাহক মশাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমবেতভাবে সমগ্র এলাকা ও পয়ঃপ্রণালী পরিচ্ছন্ন রাখুন। জল জমতে দেবেন না। কোথাও জল রাখার প্রয়োজন হলে ঢাকা দিন এবং/ অথবা সাতদিনে একবার জমা জল পাল্টে ফেলুন
- বাড়ির চারপাশ, ছাদ, নর্দমা এবং বাড়ির মধ্যেটা পরিষ্কার রাখুন। কোথাও জল জমতে দেবেন না। জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার ও ঢেকে রাখুন
- এলাকার জলাশয়গুলি সংস্কার ও সংরক্ষণ করুন। মশার লার্ভাভুক গাপ্পি ও গাম্বুসিয়া মাছ ছাড়ুন
- দিনে ও রাতে ঘুমোনোর সময় মশারি ব্যবহার করুন
- জ্বর হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখান ও রক্ত পরীক্ষা করান

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক প্রকাশিত
যোগাযোগ: ssunnayan@gmail.com • ওয়েবসাইট: www.ssu2011.com
বিনিময় : ৮০ টাকা